ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ।। ২১ চৈত্র ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৫ এপ্রিল, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

মুসলিম সংরক্ষণ

ভারতভাগের বিষাক্ত বীজ

নটরাজ ভারতী।। বিভাজনের বিষাক্ত বীজ রোপনের চেষ্টা চলছে। আমরা জুলজুল করে দেখছি। তাবড় পশ্চিমবঙ্গের নানা দরের নানা ঘরের নেতারা দেখছেন, ছোট বড় মাঝারি নানা খোপের নানা সাইজের বুদ্ধিজীবীরা অথবা দুর্বুদ্ধিজীবীরা দেখছেন। স্কুল কলেজের তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা দেখছে। অথচ শুধু দেখেই চলেছি। ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রকে একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর

নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে 'বাঙালী' তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি গত ৩০ বছরের কম্যুনিস্ট শাসনে বাঙালী শুধু মেরুদণ্ডহীন আত্মঘাতী হয়নি, ভীরু এবং কাপুরুষ হয়েছে। নিদেনপক্ষে আমরা হিজড়েদেরও অধম। হাততালি দিয়ে দুটো গাল দেবার ক্ষমতাও আমরা হারিয়েছি।

রাজ্যটা নাকি ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গরাজ্য। এখন সেই ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গরাজ্যেই সংরক্ষণ হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে, মুসলিমদের জন্য। আজব বাত। এতদিন নাকি মুসলমানদের জন্য কিছুই করা হয়নি। এতদিনে মনে পড়েছে। সুতরাং এই যাবার বেলায় করে ফেলো। সময় কম। অতএব এবার সংরক্ষণ চাই ধর্মের ভিত্তিতে। যেমন করেই হোক ফের ভারত ভাগের বীজ রোপণ করতেই হবে। ঠিক এভাবেই অর্ধেক দেশ গেছে। আমাদের চেতনা নেই। বাংলার তথাকথিত নেতা আর প্রাজ্ঞ বা বিজ্ঞজনেদের চিন্তা আর চেতনার শরীরে আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কিছুই নেই, একটু লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হবে। সেই আন্ডারওয়্যারটুকু খুলে উদোম হবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। আর এই একটা ব্যাপারে সরকার পক্ষ বিরোধীপক্ষ সব এক। অদ্ভুত ঐক্য। আমরা জানি এই ঐক্য ধান্ধাবাজির ঐক্য। লক্ষ্য নির্বাচন।

সংরক্ষণ হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে। চুপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা। নিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ প্রবক্তারা পান থেকে চুন খসলেই যারা গুজরাট আর মধ্যপ্রদেশের মুন্ডুপাত করে তারা সব কোথায়। নেতাদের এমন ভাব-যেন এতদিন কিছু করা যায়নি। এবার সুযোগ পেতেই আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা করে ফেলেছি। ভাবটা এমন এবার মুসলমানদের উন্নতি না হয়ে যায় না। গড়গড়িয়ে চলবে উন্নতির রথ।

(এরপর ৪ পাতায়)

শাঁখের করাত 'হেট মোদী ব্রিগেড'

সংবাদ মাধ্যমের নির্লজ্জ অপপ্রচার

নরেন্দ্র মোদীর পাশে দেশের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণ। গত ২৮ মার্চ গুজরাট ল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বালাকৃষ্ণণ সভাপতি, মোদী প্রধান অতিথি। হেড মোদী ব্রিগেডের ষড়যন্ত্র বানচাল করে গণতন্ত্র আর নরেন্দ্র মোদী শরিক হলেন একই পথের।

গুরুপুরুষ।। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষ তদন্ত দলের' জেরার মুখোমুখি হতে নারাজ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন একটা অপপ্রচার সংবাদমাধ্যম মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লাগাতার সারা দেশজুড়ে চালিয়ে ছিল। সেই মিথ্যা প্রচারের বেলুন ফাঁসিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী গত ২৭ মার্চ শনিবার গান্ধীনগরে বিশেষ তদন্তকারী দলের অন্যতম প্রধান কর্তা সিবিআইয়ের প্রাক্তন ডি আই জি অশোক কুমার মালহোত্রার সওয়াল-জবাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। দুই দফায় প্রায় দশ ঘণ্টা মোদীকে জেরা করা হয়। এই দশ ঘণ্টার সওয়াল-জবাবের পুরোটাই ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। শুধু তাই নয়। জেরাতে মোদী যা কিছু বলেছেন তা স্টেনোগ্রাফাররা দ্রুত লিখে পরে তাঁকে দিয়ে বয়ানে স্বাক্ষর করিয়েছেন। এর কোনও পর্যায়েই মোদী আপত্তি করেননি। বরং সবরকমভাবে তদন্তকারী দলের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

এরপরেও হিন্দু বিরোধী 'হেট মোদী ব্রিগেড' খুশি নয়। তারা জোরদার প্রচার চালিয়েছে যে বিশেষ তদন্ত দলের তলবে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রমাণিত যে মোদী গুজরাতের দাঙ্গায় জড়িত ছিলেন। এরপর তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকা অনুচিত। চমৎকার যুক্তি। হাজিরা না দিলে তিনি অপরাধী। তিনি সত্য গোপন করতে চাইছেন। হাজিরা দিয়ে দশ ঘণ্টা ধরে তদন্তকারী অফিসারের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেও তিনি অপরাধী। যুক্তি, মোদী দাঙ্গায় জড়িত বলেই এত দীর্ঘ সময় তাঁকে জেরা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের 'হেট মোদী ব্রিগেড' আদতে শাঁখের করাত। আসতেও কাটে, যেতেও কাটে। প্রতিটি খবরের কাগজে লেখা হয়েছে যে মোদীকে তদন্তকারী অফিসার মালহোত্রা দুই দফায় মোট ৬৩টি প্রশ্ন করেন। অথচ তদন্ত দলের প্রধান কর্তা আর কে রাঘবন বলেছেন, প্রশ্নের ওই সংখ্যাটা সংবাদমাধ্যম বানিয়ে লিখেছে। টিভি চ্যানেলকে খাওয়ানো হয়েছে অথবা নিজেরাই কল্পনা করেছে। একটা কারণ থাকতে পারে। যে অভিযোগের ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ তদন্ত দল (সিট) গঠন করেছে সেখানে মোদী সহ মোট ৬৩ জনকে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। যতজন অভিযুক্ত, ততগুলি প্রশ্ন।

ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীকে কলঙ্কিত করতে এই অপপ্রচার নয়। সংবাদমাধ্যম এবং বিদেশি অর্থে প্রতিপালিত বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নেত্রীরা অন্ধ হিন্দু বিরোধিতার জন্যই লাগাতার অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা ভয় পেয়েছে, দেশে হিন্দু ক্ষাত্র শক্তির উত্থান হলে তাদের মতো পরজীবীদের সর্বনাশ হবে। তারা ভীত সন্ত্রস্ত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গুজরাটের সার্বিক উন্নয়নে। ভারতের দ্বিতীয় কোনও রাজ্য এমন সাফল্যের ধারে কাছে নেই। পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধবাবুরা এতকাল শিল্পোন্নয়নের স্লোগান দিয়ে রাজ্যবাসীকে ভাঁওতা দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী 'শিল্পোন্নয়ন'

(এরপর ৪ পাতায়)

জম্মু-কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে : আর এস এস

প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন করছেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। পাশে সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত কয়েক বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরের ঘটনা প্রবাহ যে খাতে বইছে তা উদ্বেগের বিষয়। কেন্দ্র ও জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কাজকর্ম আবার বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে উসকে দিচ্ছে। গত ২৬ থেকে ২৮ মার্চ কুরুক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার এক প্রস্তাবে এই মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ওই প্রস্তাবে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের অগণতান্ত্রিক, তপশিলীজাতি-বিরোধী, মানবাধিকার বিরোধী, মহিলা-বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। রাজ্যের হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজকর্মকে নির্লজ্জভাবে জম্মু-কাশ্মীর সরকার মদত দিচ্ছে। বিপথগামী ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনার নামে পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের আমদানি করতে উদ্যোগী হয়েছে। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট (ডিসকোয়ালিফিকেশন) বিল-এর আড়ালে হিন্দু মহিলাদের বিবাহের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিধি সভা তাই উদ্বিগ্ন বোধ করছে।

ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বৈঠকের উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। তাঁর পাশে ছিলেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ শ্রী ভাইয়াজী যোশী।

বৈঠকের প্রথমদিনে সরকার্যবাহ শ্রীযোশী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে সাংগঠনিক বিবরণ পেশ করেন। এই বৈঠকে দেশের সব প্রান্ত থেকে ৯৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। কাশ্মীর এবং গো-গ্রাম যাত্রা নিয়ে মোট দু'টি প্রস্তাব নেওয়া হয়। গো-সম্পদরক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে এই যাত্রাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে। শ্রীযোশী তাঁর প্রতিবেদনে জানান—গত কয়েকবছরে সঙ্ঘের দৈনন্দিন শাখার সামান্য কমা-বাড়া লক্ষ্য করা গেলেও একধরনের স্থিতাবস্থা বজায় আছে। সারাদেশে শাখার সংখ্যা এখন ৩৯ হাজার ৮২৩। ইদানিং গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শাখা টোলী এবং

(এরপর ৪ পাতায়)

মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার

বিতর্ক অনাবশ্যক, অনভিপ্রেত ও অনুচিত

অর্ণব নাগ।। গত ১ মার্চের সাপ্তাহিক স্বস্তিকায় প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকারটি সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এনিয়ে গত ২০ মার্চ একটি দৈনিক পত্রিকায় 'সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ উঠল মহাশ্বেতা দেবীর বিরুদ্ধে' শীর্ষক প্রতিবেদনে স্বস্তিকার নাম না করেই মহাশ্বেতা দেবীর বিপক্ষে আমাদের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগের সংবাদ পরিবেশিত হয়। এর পরবর্তীতে গত ২৭ মার্চ আরও একটি দৈনিক সংবাদপত্রে মহাশ্বেতা দেবীর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি স্বস্তিকার নাম না করে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'মুসলিম বিদ্বেষে'র যে অভিযোগ স্বস্তিকার পাতায় করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যে। এর পরের দিনই অর্থাৎ ২৮ মার্চ ওই দৈনিক পত্রিকাতেই

'স্বস্তিকা'র নাম করেই এবার তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'মুসলিম বিদ্বেষে'র প্রচার চালাচ্ছি আমরা।

মহাশ্বেতা দেবী একজন প্রবীণা লেখিকা। তাঁর সঙ্গে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে যে সাক্ষাৎকারটি সেদিন গৃহীত হয়েছিল, তাতে আগাগোড়া একটা শ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রাখা হয়েছিল। তিনি পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে যা লিখেছিলেন অর্থাৎ মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, এই 'সেন্টিমেন্ট'কে আঘাত করা স্বস্তিকার কাজ নয়। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন, তাকে আমরা কোনওরকম বিকৃত না করে বরঞ্চ ভালভাবে যাচাই করেই সেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথাবার্তার পুরোটাই তাঁরই অনুমতিক্রমে আমরা ক্যাসেটবন্দী

(এরপর ১৩ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

আলিপুরদুয়ারে ৭০ জোড়া জনজাতি দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

প্রাণপ্রতিম পাল ঃ আলিপুরদুয়ার॥ আলিপুরদুয়ার শহর থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে হাতিপোতা গ্রাম। জয়ন্তী পাহাড়ের কোলে এই গ্রামের পরিবেশও অতি মনোরম। এই শান্ত, সুন্দর পরিবেশে বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হলেন ৭০ জোড়া দম্পতি। সম্পূর্ণ হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরা মেনে হাতিপোতা বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হলো বিবাহ অনুষ্ঠান। আর এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকল গোটা এলাকা।

হাতিপোতায় গণবিবাহ অনুষ্ঠান

গত ২২ মার্চ কুমারগ্রাম ব্লকের হাতিপোতা বাজার এলাকায় সকাল থেকে ব্যস্ততা চোখে পড়েছিল। বিশ্বনাথ মন্দিরকে বাহারি আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সাত পাঁকে বাধা পড়বে ৭০ জোড়া দম্পতি। এদিন কুমারগ্রাম ব্লকের সঙ্কোশ, নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম, রায়ডাক, দুনিয়াজোড়া প্রভৃতি চা বাগান থেকে জোড়ায় জোড়ায় জনজাতি সম্প্রদায় সামূহিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হাতিপোতা এসে পৌঁছায়। চলে জনজাতি নৃত্য ও সঙ্গীত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি আর. বি. রাই বলেন, জনজাতি সমাজের গরীব লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত টাকা পয়সা খরচ করে বিয়ে করতে পারে না। হিন্দু মতে তাদের বিয়ে না হলে তারা সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। এমনকী তাদের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। শুধু তাই নয়, সমাজের নানা কাজে তাদের প্রতি পদে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জনজাতি সমাজের দরিদ্র দম্পতিদের বিবাহ করিয়ে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

হাতিপোতা মন্দির প্রাঙ্গণে বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে চলছে হোম-যজ্ঞ। সারি সারি দম্পতি পাশাপাশি বসে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বর কনেকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। সেই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থাকল কয়েক হাজার নিমন্ত্রিত অতিথি। কেউ কেউ আবার গোটা ঘটনাকে ক্যামেরা বন্দি করল। মন্দিরের পাশের মাঠে জনজাতিদের বাদ্যের তালে তালে পা মেলাল অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। গোর্খা ও নেপালী সম্প্রদায়ের লোকেদের এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আলিপুরদুয়ার সাংগঠনিক জেলার সংগঠন সম্পাদক প্রদীপ থাপা বলেন, এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ জন নিমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরাট এই কর্মযজ্ঞে সকলের সহযোগিতা তারা পেয়েছেন। ২০০৬ সাল থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জনজাতি সমাজের দরিদ্র দম্পতিদের সামূহিক বিবাহের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। প্রদীপবাবু বলেন, এই বিবাহে বর পক্ষের ১০ জন, কনে পক্ষের ১০ জন প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন। এছাড়া বরযাত্রীতো রয়েইছে। সামূহিক বিবাহ উপলক্ষে বর ও কনেকে শাড়ি, শাল, সিঁদুর, পাঞ্জাবি, ধুতি, শাখাসহ অন্যান্য বিবাহের উপকরণ দিয়েছে পড়ার মতো। সঙ্কোশ চা বাগানের দম্পতি সিকন্দর তিরকি, সুরজমনি তিরকি, নিউল্যান্ডস বাগানের সানি তুরি, আশ্রিতা তুরির মতো দরিদ্র জনজাতি দম্পতিরা এদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরে খুশি হয়েছেন। খুশি হয়েছেন তাদের সন্তানরা। তারা বলেন, বাবা-মায়ের সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় বিভিন্ন পূজা-পার্বণে তারা অংশগ্রহণ করতে পারতো না। মা-বাবার বিয়ের মধ্য দিয়ে সেই সমস্যায় সমাধান হলো।

আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠানে ভি এইচ পি-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য দত্ত, সহ-সভাপতি (কোচবিহার) চৈতন্য দে, এবিভিপির প্রাদেশিক সহ-সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কোচবিহার জেলার সংগঠন সম্পাদক বাবলু সূত্রধর, মনবাহাদুর ছেত্রী, রেশমা রাই প্রমুখ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। শেষে ভুরি ভোজের ব্যবস্থাও করা হয়।

এই সময়

পারমাণবিক কূটনীতি

পারমাণবিক চুক্তিকে আমেরিকার বৈতরণী পার করাতে, সংসদের ওপর আর ভরসা করতে পারছেনা কংগ্রেস। গত ২৯ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা-র প্রশাসনিক দপ্তর থেকে জানান হয়েছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে নিউক্লিয়ার জ্বালানী পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে। কূটনৈতিক মহল যেটাকে 'পারমাণবিক চুক্তি'র আগাম ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন। কারণ ইন্টারন্যাশানাল অ্যাটোমিক এনার্জী এজেন্সি (আই এ ই এ)-র 'নিরাপদ' শংসাপত্র নিয়েই ওই নিউক্লিয়ার জ্বালানী আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আই এ ই এ পুরোপুরি ভাবেই মার্কিন কব্জায়। সুতরাং এটুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় যে নিউক্লিয়ার আদান-প্রদান বজায় রেখেই কূটনৈতিক স্তরে আজ থেকে আঠারো মাস আগে আটকে যাওয়া পারমাণবিক চুক্তিটি হয়তো সম্পাদিত হয়ে যাবে। তবে দেশবাসীকে ফাঁকি দিয়েই সেটা হবে।

মোদী 'বিছুটি'

কুইজ্যের রিয়েলিটি শো'-এর জনপ্রিয়তম প্রশ্ন, নরেন্দ্র মোদী বর্তমানে কংগ্রেসের কাছে কিরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন? সহজ উত্তর—জল বিছুটি রূপে। যখনই কংগ্রেস তাঁকে মওকা বুঝে (মানে গুজরাট দাঙ্গার নাম ভাঙিয়ে) ধরতে যাচ্ছে, তারপর এইসান চুলকোচ্ছে যে বাপ বাপ বলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। 'সীটে'র পর দেশের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণনের সঙ্গে একমঞ্চে নরেন্দ্র—এই ধাক্কাটা সামলাতে সামালাতেই মোদীর সঙ্গে দেখা গেল বিগ বি মানে অমিতাভ বচ্চনকে। প্রথমে নরমে-গরমে অমিতাভকে সমঝে দেবার চেষ্টা হলো। অমিতাভ বলার চেষ্টা করলেন যে তিনি গুজরাটের ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডার। কিন্তু 'কংগ্রেসী রাজনীতি' বন্ধ হবার নয়। তাই এবার ঝেড়েই দিলেন বিগ বি; বললেন কংগ্রেস হলো—অস্পৃশ্যতার তালিবান। যাইহোক, এহেন বিশেষণে একদম চুপ তারা।

নাকচ মুক্তি

খারিজ হয়ে গেল নলিনী শ্রীহারনের মুক্তির আবেদন। এই সেই নলিনী যিনি স্রেফ তার প্রেমিক মুরুগানের পাল্লায় পড়ে রাজীব হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন। প্রেমের মূল্য চোকাতে আপাতত দু'দশক সময় ধরে তিনি তামিলনাড়ুর কারাগারে বন্দী রয়েছেন। প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে কারাগারেই জন্ম দিয়েছেন একটি কন্যা সন্তানের। গত ২৯ মার্চ মাদ্রাজ উচ্চ আদালতে বিচারপতি এলিপ ধর্মরাও এবং বিচারপতি কে কে শশীধরনের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে অ্যাডভোকেট জেনারেল পি এস রামন বন্দী-পরামর্শদাতা পর্ষদের প্রতিবেদন উল্লেখ করে জানান, নলিনীর 'প্রি-ম্যাচিওর' মুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই। একথা শোনার পরেই নাকচ হয়ে যায় তাঁর মুক্তির আবেদন।

নয়াচর সমাচার

শিল্পদ্যোগী বাম সরকারের শিল্প-প্রয়াস সংক্রান্ত নয়াচর-মার্কা 'সুখের সন্ধান' যে দু'হাজার এগারো পূর্ব বঙ্গদেশে আর মিলবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। 'জমি অধিগ্রহণ কাণ্ডে'র স্মৃতি এদেশের শিল্পপতিদের মনে সতত বিরাজমান। সুতরাং নয়াচরে তাদের আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অন্যদিকে 'চেরনোবিল' থেকে শিক্ষা নিয়েছে প্রথম বিশ্বের দেশগুলো। তারা তাদের দেশে কেমিক্যাল হাব গড়তে দিতে নারাজ। সুতরাং সেদেশের শিল্পপতিদের চোখ তৃতীয় বিশ্বের দিকে। তাদের এই মনোভাবের কথা জেনেই নয়াচর প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক নন্দিনী চক্রবর্তী আমেরিকা সফর করছেন, নয়াচরে পেট্রো-রসায়ন শিল্পে লগ্নি আনার তাগিদে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম সচিব বিজয় চট্টোপাধ্যায় নয়াচর পরিদর্শন করে এনিয়ে ব্যাপক উৎসাহিত বোধ করে গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় পৃথক কেমিক্যাল শিল্পতালুক গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

ধনীতম তৃতীয় বিশ্ব

যে অর্থনৈতিক পণ্ডিতকূল আর্থিক ধন-সম্পদের নিরীখে ভারতকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে আসছিলেন আই পি এল নামক ক্রিকেটীয় বাণিজ্যটিকে দেখলে তাঁরা তাদের মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগকে পেছনে ফেলে আই পি এল এখন দু'নম্বরে। তাদের সামনে কেবলমাত্র আমেরিকার ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। কিন্তু এতে আত্মশ্লাঘা বোধ করার কোনও কারণ নেই। দেহের সব রক্ত মুখে জমা হলে আর যাই হোক তাকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যায় না।

সফল উৎক্ষেপণ

গত ২৮ মার্চ অগ্নি-১ ব্যালিস্টিক মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণের সাক্ষী থাকলে ওড়িশা উপকূলের হুইলার দ্বীপ। প্রসঙ্গত, ৭০০ কিমি 'স্ট্রাইক রেঞ্জে'র নিউক্লিয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন এই মিসাইলটি ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বলয়ের খাতিরে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি একইসাথে রাস্তা এবং রেল উভয়কেই 'মোবাইল লঞ্চার'র মাধ্যমে আঘাত করতে পারবে। এটি পরিচালিত হচ্ছে ট্রি-সার্ভিস স্ট্রাটেজিক ফোর্সেস কম্যাণ্ড (এস এফ সি) -এর মাধ্যমে। মূলত পাকিস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে অগ্নি-১ তৈরি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে যে পৃথ্বী মিসাইল তৈরি করা হয়েছিল তার 'রেঞ্জ' ছিল ১৫০ থেকে ৩৫০ কিমি। সেদিক দিয়ে দেখলে অগ্নি-১ যথেষ্টই শক্তিশালী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুস্থানে হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রীর হেনস্থা নজিরবিহীন

বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্ট অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের তৈরি কংগ্রেস দলের শীর্ষে এখনও রয়েছেন একজন বিদেশিনী। যদিও কংগ্রেস কোনওদিনই ভারতীয় সনাতন হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষায় নিজেদের সমর্পিত করেনি, তথাপি আজ একজন বিদেশিনী কংগ্রেস দলের অন্তরাত্মা হওয়ায় হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আক্রমণে নতুনত্ব কিছু নাই, বা আশ্চর্য হইবারও কোনও মানে হয় না। তফাৎটুকু শুধু কৌশলে।

কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়াই এই বিদেশিনী কংগ্রেস দলের অন্তরাত্মায় পরিণত হইয়াছেন আর দেশের সংস্কৃতির পক্ষে হইয়া উঠিয়াছেন দুরাত্মা। প্রাক্তন বৃটিশ শাসকের মতো তাঁহারও বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে এই দেশের প্রাণভ্রমরা হইল ধর্ম আর সেই ধর্ম ইউরোপের রিলিজিয়ন নহে। এদেশের ধর্ম, এদেশের সংস্কৃতির সমার্থক। হিন্দু সংস্কৃতিজাত এই সনাতন হিন্দু ধর্ম ধারণ করিয়াছে এদেশের জীবন প্রণালীকে। হিন্দু, হিন্দুস্থান, হিন্দু ধর্ম একে অপরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাই হিন্দুত্ব।

অতএব এই হিন্দুত্বকে কলুষিত না করিতে পারিলে এই হিন্দুস্থানকে কব্জা করা অসম্ভব। তাই অক্টোভিয়ান হিউম ও জওহরলালের উত্তরসূরী এই বিদেশিনী মহিলা একের পর এক কৌশল ফাঁদিয়াছেন। তিনি টার্গেট করিয়াছেন রামমন্দির উদ্ধারের আন্দোলনের নেতা-নেতৃদের। তিনি টার্গেট করিয়াছেন গুজরাত দাঙ্গা নামক এক গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দকে। গোধরায় ট্রেনে অবরুদ্ধ হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জীবন্ত দগ্ধকারী দুষ্কৃতীদের তিনি টার্গেট করেন নাই। কারণ তাহারা যে হিন্দুত্বে বিশ্বাসী নয়। এই নোংরা কাজে তিনি এক সময়কার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিরপেক্ষ সি.বি. আই-কেও নিরপেক্ষতা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আজ সি. বি. আই পরিণত হইয়াছে নিছকই কংগ্রেসের সভানেত্রীর 'আর্মড গার্ডে'।

একইভাবে কাজে লাগানো হইতেছে এতকালের সুখ্যাত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকেও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চ আদালত কিংবা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি নির্বাচনেও কংগ্রেসী অন্তরাত্মার হস্ত। প্রধান বিচারপতিরা যেহেতু অবসর গ্রহণের প্রাক-মুহূর্তে নির্বাচিত হন, তাই তাহাদের লোভ দেখানো হয় অবসরের পর কোনও তদন্ত কমিটি বা কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠানের। এই লোভের বশবর্তী হইয়া অনেকেই সরকারি দলের পদলেহী হইয়া পড়িতেছেন এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে অনেক মামলার রায়ের মধ্যে। এই সমস্ত বিচারপতিগণের তদন্ত কমিশন বা কমিটি (রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি, শ্রীকৃষ্ণ কমিটি, সাচার কমিটি, লিবারহান কমিশন ইত্যাদি) পূর্ব-নির্দেশ মতোই রিপোর্ট পেশ করিয়া থাকে। এই সমস্ত কমিটি-কমিশনের রিপোর্ট বা সুপারিশ সময় মতো জনগণের নিকট নিজস্ব বাহিনী মারফৎ ফাঁস করিয়া দেওয়া হয়। সংসদ সরগরম করা হয়। এসবই করা হয় হিন্দুত্ববাদীদের হেনস্থা করিবার লক্ষ্যে, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য হইতেছে হিন্দুত্ববাদের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগানো। ইহাতে কিছু জনগণ যে বিভ্রান্ত হন না তাহা নহে। কারণ হিন্দুরা প্রধানত ভোলে-ভালা, এক আত্মবিস্মৃত জাতি।

দুর্ভাগ্য সেইখানেই, হিন্দুস্থানেই সমানে চলিয়াছে হিন্দু ও হিন্দুত্বের চরম হেনস্থা। যাহারা অবিভক্ত ভারতবর্ষের হিন্দু মঠ-মন্দিরের ইতিহাসের খোঁজ খবর রাখেন তাহারা নিশ্চিত জানেন বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সেই সমস্ত মঠ-মন্দির একটিও নাই। ভারত সরকারের মাধ্যমে কংগ্রেস দল অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিকস্তরেও ইহা লইয়া কোনও প্রশ্ন তোলে নাই। কিন্তু একটি মন্দির মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া হিন্দুত্ববাদীরা কংগ্রেস দল এবং সরকারের হাতে যেভাবে চরম হেনস্থার শিকার হইতেছে, তাহা প্রকৃতই লজ্জার। হিন্দুস্থানে থাকিয়া হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়াও রেহাই পাইতেছে মুসলিম দুষ্কৃতীরা। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করাটাও এদেশে চরম অন্যায়। ঘটনার এত বছর পরও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেনস্থা করা হইতেছে, অথচ কাশ্মীরের কোনও মুখ্যমন্ত্রীকেও তো এত হেনস্থা করা হয় নাই। সেখানে কি হত্যালীলা চলে নাই? কিন্তু সেখানে নিহতরা যে হিন্দু, তাই কংগ্রেস দলের কোনও কর্তব্য নাই! হিন্দুর এই লজ্জার, এই অপমানের কবে অবসান হইবে? হিন্দু শক্তি কি জাগ্রত হইবে না?

জাতীয়জাগরণেরমন্ত্র

ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী দীপ্ত স্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি, ভারতাকাশ ধর্মতত্ত্বে সাধনায় পরিব্যাপ্ত, ভালই বলো আর মন্দই বলো আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্মাদর্শের সাধন ক্ষেত্র। ফলে ওই সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত শিরায় শিরায় ইহা স্পন্দিত হইতেছে এবং আমাদের প্রকৃতির সহিত, জীবনীশক্তির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশিক্ষাকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার কী গভীর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে উহা না বুজাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা চলে কি? তোমরা কি বলিতে চাও হিমতুষারালয়ে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্বার নূতন পথে প্রবাহিত হইবে? তাহাও যদি বা সম্ভব হয়—তবুও জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থ সাধনরূপে বিশেষ জীবন খাতটি পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'গ্রীন হান্ট' অপারেশন সফল হবে কি?

দেবব্রত চৌধুরী

বেশ কিছু দিন আগে পুজোর সময় সস্ত্রীক ঘাটশীলা দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের যে অঞ্চলে মানুষরা আজ গাঁইতি-কুড়ুল-তীরধনুক ও লাঠি নিয়ে লড়াইতে নেমেছে যে সব জায়গায় গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—সেখানে কি হচ্ছে তা জানতে। টাটা সুমো গাড়ীতে অনেকটা যাওয়ার পর ড্রাইভার বললো—গাড়ী আর এগোবে না—কারণ স্থানীয় জনজাতিরা আমাদের মেরে দেবে। তারা আজ আমাদের উপর ক্ষিপ্ত, কারণ শহরবাসী আমরা, সরকার চালাই আমরা, যে সরকার ওদের হত্যা করে। বাধ্য হয়ে সামনে আসা স্থানীয় এক জনজাতির সাহায্য নিই—বলি, "আমাদের একটু গ্রামগুলি দেখার সুযোগ করে দেবে, তার জন্য তোমার পারিশ্রমিক দেবো"। লোকটি রাজী হয়ে যায়, 'বলি কত নেবে?'—অনেক চিন্তাচরিত্র করে বললো "বিশ টাকা দিস"। বেলা ১১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আমাদের গাইডের কাজ করবে—তার পারিশ্রমিক মাত্র বিশ টাকা। শহরের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টার নামে কাজ করে ৭ ঘণ্টারও কম। অথচ শহরের শ্রমিকরা খুশী নয় ১৫০ টাকা মজুরী পেলেও। আরও চায় কারণ এই শ্রমিকের সাথে আছে—রাজনৈতিক দল ও ইউনিয়ন। শহরের শ্রমিক ও জঙ্গলমহলের শ্রমিকের চাহিদার ব্যবধান প্রথমেই নজরে পড়ে। প্রথম নজরে লোকটিকে বৃদ্ধ মনে হলো—জিজ্ঞাসা করি 'বয়স কত?' হেসে উত্তর দেয়—দু'কুড়ি পাঁচ মানে ৪৫ বৎসর। অবাক হয়ে দেখি ৪৫ বছরেই প্রায় ৭০ বয়সে পৌঁছে গেছে অপুষ্টির দৌলতে। জানতে চাই মোটরগাড়িকে ওরা গ্রামে ঢুকতে দেয় না কেন? সব গাড়ীতে তো পুলিশ থাকে না। ও জানায়, ওদের গ্রামের রাস্তা লালমাটি দিয়ে তৈরি। যদি মোটরগাড়ী যায় রাস্তার দুধার খাদের মতো বসে যায় আর মাঝখানা ঢিপির মতো উঁচু হয়ে যায়। রাস্তার এ রকম চেহারা দেখলে ওদের বাড়ীর গরুগুলি ভয়ের চোটে দড়ি ছিঁড়ে দৌড়তে থাকে। তাই ওরা সবাই মিলে রায় দিয়েছে গ্রামের ভিতর মোটরগাড়ী ঢুকতে দেবে না। আর গ্রামে তো সাধারণ শহরবাসী আসে না, আসে পুলিশের গাড়ী—যাদের কাজ গ্রামবাসীদের উপর হামলা করা। সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর হামলার কারণ জানতে চাইলে বলে "তুই মাওবাদীদের জল দিয়েছিস, তুই পথ দেখিয়েছিস, তুইও দোষী"। হাঁটার সময় দেখলাম ওখানে ৪০/৫০ বৎসরের উর্ধ্বে কোনও মানুষ নেই। কারণ কেউ তার বেশি বাঁচে না—বাচ্চাদের দেখলাম যথারীতি দারুণ অপুষ্টিতে ভোগা। কিন্তু গ্রামে পুলিশ বাহিনী এলে মার্কামারা স্টাইলে রাস্তায় মর্দ মুরগী এই সব লুঠ করে, কেড়ে নেয় মেয়েদের ইজ্জতও। এই লোকটির কথা আমি বিশ্বাস করি সর্বতোভাবে—কারণ পুলিশ আজ প্রকাশ্য দিবালোকে খাঁকি পোষাকের দৌলতে লুঠ করা শুরু করে দিয়েছে। কয়দিন আগেই স্টেটসম্যান পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে Special Task Force-এর চীফ এবং ট্রত্রত্ব মিঃ অশোক সেহরন্-কে পানিপথে এক স্টক্ ব্রোকারোর থেকে ৬ লাখ টাকা লুঠ করার অপরাধে সরকার গ্রেপ্তার করেছে। এই সরকারী অফিসার ২০ জন পুলিশ নিয়ে এক জুয়েলারী দোকানের মালিক শ্রী ডি. কে. মালহোত্রার কাছ থেকে ১০ লাখ ছিনিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই সময় সি সি টি ভি ক্যামেরাতে ধরা পড়েছেন। তাই যখন শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ ডাকাতি-লুঠ করতে পারে, তখন নিরীহ জনজাতি এলকায় সরকারি মদতে সবই করতে পারে আজকের বর্গীরা তথা পুলিশ বাহিনী। ওই মানুষটির সাথে চলতে চলতে রাস্তায় আরও দু'চার জন স্থানীয় জনজাতিদের সঙ্গে আলাপ হলো। ওরা বললো এখানকার অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে খুন-জখম-বিস্ফোরণ, নিহত হচ্ছে পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনীর লোকজন কিংবা বনাঞ্চলের জনজাতি মানুষ। জনজাতিরা আজ সরকারকে বিশ্বাস করে না। ওরা আমাদের হিংসার কথা প্রচার করে, কিন্তু আসলে সরকারই আমাদের কাছে সহিংস। সরকার ঘন ঘন শান্তির কথা বলেন। কিন্তু সরকার যদি সর্বদা জনজাতিদের আক্রমণ করতে ব্যস্ত থাকে তাহলে শান্তিটা আসবে কি করে?

"আজ পরিস্থিতিটা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে জনজাতিদের চোখে প্রত্যেক আগন্তুকই শত্রু। সরকার এমন অবস্থা তৈরি করেছে যাতে জনজাতিরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—বলুন আমরা বাঁচবো কি করে"

আজ পরিস্থিতিটা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে জনজাতিদের চোখে প্রত্যেক আগন্তুকই শত্রু। সরকার এমন অবস্থা তৈরি করেছে যাতে জনজাতিরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—বলুন আমরা বাঁচবো কি করে—জঙ্গলে বাবুগাছ দিয়ে দড়ি বানিয়ে গঞ্জে বিক্রী করতাম, এখন জঙ্গলে যাওয়া বারণ—আমরা জঙ্গলে ঝরে পড়া লকড়ি কুড়িয়ে আটী করে হাটে বিক্রী করতাম। এখন জঙ্গলের কিছু ছোঁওয়া যাবে না। আমরা শালপাতা কুড়িয়ে বিড়ি পাতা বা চুটার জন্য মহাজনকে বিক্রী করতাম—তাও বন্ধ। আমাদের জমি পাথুরে, চাষ তেমন হয় না। স্বাধীনতার পর ৬৪ বৎসর হয়ে গেল সরকার আমাদের জন্য কিছুই করলো না—শুধু ভোটের সময় আমাদের খোঁজ নেয়। কয়েক কেজি চাল বিলোয়, কয়েকজনকে হ্যারিকেন দেয়—কয়েক পিপা হাঁড়িয়া দেয়—ভোট শেষ—খেল খতম্—আমরাও শেষ বঞ্চনার শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছি। আমরা কোনওদিনই হিংসাত্মক ছিলাম না।

আমার মনে এখন একটা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে, যে মানুষরা নিপীড়িত-বঞ্চিত সে তো লড়বেই, এ লড়াই গরীব মানুষের লড়াই, বাঁচার জন্য লড়াই। মাওবাদীরা এতে সামিল হয়েছেন মাত্র, যদি কোনও মার্কস, কোনও গান্ধী না জন্মাতেন তাহলে কি গরীব-পীড়িত মানুষ লড়তেন না? আসলে এদের কোনও মাওবাদী বা গান্ধীবাদীর দরকার নেই। কিন্তু কখনও কখনও একজন বিনোবা-জয়প্রকাশ বা মাওবাদীরা এসে পড়ে ওদের লড়াইয়ে সামিল হয়ে যান। সরকার যদি মনে করে যে গরীব মানুষের এই বাঁচার লড়াইকে সে মিলিটারী যৌথ বাহিনী বা কোবরা বাহিনী দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে তাহলে তো ভুল ভাবছে। কখনও কখনও চরম নিপীড়ন লড়াকু মানুষকে আরও সাহসী করে তোলে। সরকার যদি শান্তি চায় তবে এক বৎসরেই আসবে—সরকার জনজাতিদের মধ্যে গিয়ে যা খুশী বিলোক, কিন্তু অঙ্গনবাড়ি-স্বাস্থ্যপরিষেবা-স্কুল-পানীয়জল-রাস্তা নির্মাণ ওদের বাঁচার সুযোগগুলি ফিরিয়ে দিক। বিনোবা ভাবে বলতেন—"অন্যায়কে মেনে নেওয়া অন্যায়। আমি গরীব মানুষকে অন্যায়কে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে সদাই প্ররোচনা দেবো"।

তাই আমার প্রশ্ন, 'গ্রীন হান্ট' সফল হবে কি?

ভারতভাগের বিষাক্ত বীজ

(১ পাতার পর)

দিদির দুরন্তকেও টেক্কা দিয়ে। যত উন্নতি তত ভোট। যত ভোট তত উন্নতি।

এখন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের সমর্থনে বক্তারা তুবড়ি ছোটাচ্ছেন। বাসি তেলেভাজা গরম করে খদ্দেরকে টাটকা বলে দেয় অনেক দোকানি। এও তেমনি। পুরোনো ইস্যু। সরকার নির্বাচিত হয় সংখ্যাগুরুর ভোটে। সরকার কাজ করে সংখ্যালঘুদের জন্য। কারণ সংখ্যাগুরুরা ঢ্যামনা। ফোঁস নেই, ফণা নেই, বিষ নেই। সংখ্যালঘুরা ডোমনা চিতি। দেখতে ছোট। তীব্র বিষ। তাই ওরা যখন যা চায় তাই পায়। না চাইতেও পায়। আমরা চেয়েও পাই না। সকলেই জানে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা যত লাফালাফিই করুক আদতে তো ঢ্যামনা।

বামবুদ্ধি জীবীরা বলছেন। অনেক বলছেন। অনেক লিখছেন। বলেই চলেছেন। লিখছেন আরও বেশী। মূল বক্তব্য একই। মুসলমানদের জন্য অনেক কিছু করা হয়নি। ওদের চাহিদা মেটানো হয়নি। তাই এই সংরক্ষণ। মিথ্যা কথা। চরম এবং চূড়ান্ত মিথ্যা কথা। বাস্তব অন্য কথা বলে। ১৯৪৬ থেকে ২০১০। ৬৪ বছর মুসলমানরা যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। তালিকা বেশ দীর্ঘ। ৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা। মুসলমানরা চেয়েছিল। হয়েছে। নোয়াখালি আর ভাগলপুরে হিন্দু নিধন। মুসলমানরা চেয়েছিল। হয়েছে। ভারতকে টুকরো করে শুধু মুসলমানদের জন্য একটা দেশ চেয়েছিল। দুটো দেশ পেয়েছে। কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের তাড়াতে চেয়েছিল। তাড়িয়েছে। না চাইতেই কাশ্মীরের অর্ধেকটা পেয়েছে। ভারতকে সন্ত্রাসবাদীদের আখড়ায় পরিণত করতে চেয়েছিল। করেছে। বাংলাদেশ থেকেই অনুপ্রবেশকারী ঢোকাতে চেয়েছিল; ঢুকিয়েছে। ভারতবর্ষে থেকে নিজেদের আলাদা আইন চেয়েছিল। পেয়েছে। ইসলামী শাসন চালাতে চায় সমান্তরালভাবে। চালাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা গড়ে উগ্র ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। তাও চলছে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। টোল থেকে সংস্কৃত পড়ে সরকারী চাকরী পাওয়া যায় না। কিন্তু মাদ্রাসায় আরবি পড়ে আর উর্দু পড়ে দিব্যি পাওয়া যায়। ওরা চেয়েছিল হজের টাকা, পেয়েছে। ওরা চেয়েছিল শুধু মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়। হয়েছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। হয়তো আরও হবে। ওরা চেয়েছে পার্লামেন্টে হামলাকারীকে যেন ফাঁসি না দেওয়া হয়। তাই আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ফাঁসি হয়নি। ওরা কলকাতা থেকে তসলিমাকে তাড়াতে চেয়েছিল। তাড়িয়েছে। এমন আরও আছে। এটাই বাস্তব। তবুও আমরা চিৎকার করবো। আমরা বলবো মুসলমানদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। একবারও নিজেকে জিজ্ঞাসা করবো না—আর কি করা উচিত ছিল আমাদের। একবারও ভাববো না যত জঙ্গি ধরা পড়ছে তারা সকলেই মুসলমান ধর্মের লোক কেন। তাদের বেশীর ভাগ শিক্ষিত। অধ্যাপক শিক্ষকও আছে। এই সামান্য প্রশ্নটুকু করার অধিকার হিন্দুর নেই। তাকে সাম্প্রদায়িক বলে গালাগালি দেওয়া হবে। হিন্দুকুলের অঙ্গাররা তাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। পারলে ছিঁড়ে খাবে। কারণ হিন্দুরা কাপুরুষ, দুর্বল।

অথচ সংখ্যাগুরু হিন্দুরা যা চায় পায় না। একটা বিতর্কিত কাঠামো দীর্ঘদিনের কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলে ভগবান রামের নামে একটা মন্দির চেয়েছিল। কাঠামো ভেঙ্গেছে। কিন্তু এখনও মন্দির বানাতে পারেনি। একটা নিরাপদ সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্র চেয়েছিল। হিন্দুরা তাও পায়নি। এদেশের সকল হিন্দু চেয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে সকলের জন্য এক আইন হোক—আজও হয়নি। সকলের জন্য এক আইনের কথা বিজেপি ছাড়া কেউ বলে না। হিন্দুরা চেয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত ভাষার জননী স্বরূপ সংস্কৃত ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। হয়নি। সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বলা হচ্ছে। হিন্দুরা চেয়েছিল কাশ্মীরে কড়া পদক্ষেপ নিক সরকার। কাশ্মীরের পন্ডিতরা নিজেদের বাসভূমে ফিরে যাক। হয়নি। কোনও চেষ্টাও নেই। অর্থাৎ এদেশে তাই হয় যা সংখ্যালঘুরা চায়। তা হয় না যা দেশের বেশীর ভাগ মানুষ চায়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলায় যেসব মুসলমান বাস করেন তাদের কেউই উর্দুতে কথা বলেন না। সকলেই বাংলা বলেন। তবুও প্রতিদিন সরকারি চ্যানেলে বাংলা খবরের পরেই উর্দু খবর। এই বাংলার সমস্ত জনজাতি এখনও নিজেদের অলচিকি ভাষায় কথা বলে। তবু নিয়মিত বাংলা খবরের আগে বা পরে জনজাতি ভাষায় কোনও খবর নেই। দীর্ঘদিন ধরে জনজাতি ভাষায় শিক্ষার দাবী সাঁওতালদের। তবু সবচেয়ে অবহেলিত অনুন্নত সাঁওতালদের জন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। কোনও পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হয় না। ইসলামি সংস্কৃতি বাঁচাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা। চুলোয় যাক ভারতের জনজাতি সংস্কৃতি।

তবুও আবার সংরক্ষণ। মুসলমানদের জন্য। কারণ মুসলমানরা এখন দিদির দলে। ওদের আবার দলে টানতে হবে। সামনে ভোট। চুলোয় যাক হিন্দুরা। আবার বিদ্বেষ। আবার বিষ। আবার ঘৃণা। এভাবেই ভারতভাগের পটভূমি রচনা করেছিল বিশ্বাসঘাতক কম্যুনিস্টরা। এবারেও সেই বীজ বহন করে তার গোড়ায় জল দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। ঠিক একই পরম্পরায়।

ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন আর বিভেদের এই চেষ্টা কম্যুনিস্টদের প্রথম নয়। দেশের সঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের এই বিশ্বাসঘাতকতা চিরকালের। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের আগে ঠিক এভাবেই ভাগের পটভূমি তৈরী করেছিল কম্যুস্টিরা। সাজ্জাদ জাহির নামে এক কম্যুনিস্ট নেতা বলেছিলেন—"মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবী ন্যায্য দাবী"। ভারতভাগের চারবছর আগে থেকেই কম্যুনিস্টরা ভারতভাগের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এসব কথা এতদিন পরে আবার বলতে হচ্ছে। কারণ আমাদের স্মৃতি দুর্বল। এই প্রজন্ম দেশভাগের ইতিহাস জানে না। কম্যুনিস্টদের দেশদ্রোহিতা বা চরম বিশ্বাসঘাতকতার কথাও জানে না।

কম্যুনিস্টদের অনেক নেতা বলছেন—গরীব মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে সব মুসলমানদের জন্য তো নয়। এ হলো আরেক ভন্ডামি। একে নপুংসকের ন্যাকামিও বলা যেতে পারে। গরীব মুসলমানরা কি মুসলমান নয়। এতো আমার সেই বৈষ্ণব দাদুর মতো। বলিদানের মাংস খেতেন। অন্য মাংস খেতেন না। বলতেন বলিদানের মাংস তো প্রসাদ। ওটা খাওয়া যায়। নির্ভেজাল ভণ্ডামি। আর গরীব মুসলমানদের জন্য যদি সংরক্ষণ হয় তাহলে গরীব হিন্দুদের জন্য নয় কেন? দুটোই গরীব। হিন্দু গরীবের পেটের খিদে আর মুসলমান গরীবের পেটের খিদের তফাৎটা কোথায়? ছেলেকে খেতে দিতে না পারলে হিন্দু মা-ও কাঁদে—মুসলমান মা-ও কাঁদে, দুটোই চোখের জল। তফাৎটা কোথায়। তাহলে মুসলমান গরীবের জন্য সংরক্ষণ হলে হিন্দু গরীবের জন্য হবে না কেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। পারে না তার কারণ হিন্দুরা ভীরু এবং কাপুরুষ। বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুরা। সুন্দরী নারীর স্পর্শ ছাড়া এখনকার বাঙালী হিন্দু যুবকেরা আর কোনও কিছুতেই উত্তেজিত হয় না। মা বোনেরা লাঞ্ছিত হলেও না।

এখন বাংলা জুড়ে রাজনৈতিক পালা বদলের হাওয়া। বিভিন্ন দলে দলে কত বিরোধ। কথায় কথায় ঝামেলা। যে কোনও ইস্যুতে। ভালো হোক বা খারাপ। লড়াই চলছেই। এই সব হস্তীমূর্খ নেতারা মাপে বড়। দাপে আরও বড়ো। কিন্তু বুদ্ধি তে জড়। আর জনগণ তো জরদগব, স্থবির। সংরক্ষণ হাওয়া ওঠার পর সব দলের মুসলমান নেতারা কিন্তু এক হচ্ছেন। এখানে আর কোনও বিরোধ নেই। বামফ্রন্টের সেলিম মুন্সী, রেজ্জাক মোল্লা, কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, তৃণমূলের ইদ্রিস আলী, পি.ডি.সি. আই-এর সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সব এক। সংরক্ষণ চাই। কারণ জনগণ জানে না। ওরা জানে। ওরা বোঝে আমাদের দল আলাদা। রাজনীতি আলাদা। কিন্তু আমাদের ধর্ম এক। আমরা সবাই মুসলমান। আগে ধর্ম পরে রাজনীতি। দেশ আরও অনেক পরে। আমরা দেখছি। শুধু দেখছি। কিছু করছি না।

ধর্মের ভিত্তিতে ধর্ম আর সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যদি সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে তো সবার আগে বৌদ্ধদের জন্য করা উচিত। শান্তির ক্ষেত্রে যাদের কাজে আর কথায় তফাৎ নেই। শান্তির ধর্ম মুখে বলে যারা অন্তত অন্য ধর্মের লোকেদের কোতল করে না। সামান্যতম হিংসাকেও যারা প্রশয় দেয় না আর অহিংসা প্রচার করতে গিয়ে যারা নিজেরাই লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পৃথিবীর স্বার্থেই তাদের সবরকমের সংরক্ষণ দরকার। কিন্তু ভোট বড় বালাই।

অথচ একদিনেই পাশা পাল্টে দেওয়া যায়। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নিয়ে শুধু আওয়াজ তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্র হিন্দুর সংখ্যা অন্তত ৫০ লক্ষ। ওই ৫০ লক্ষ লোকের দশ শতাংশ অর্থাৎ ৫ লক্ষ লোকও যদি আওয়াজ তুলতে পারতো! গরীব হিন্দুদের সংরক্ষণের দাবী। যদি একদিনের জন্য তারা পশ্চিমবঙ্গ অচল করে দিতে পারতো! রাজনীতির প্ররোচনায় পা না দিয়ে শুধু গরীব আর হিন্দু বলে সংরক্ষণের দাবী করা যেত। যদি আমরা ওদের বোঝাতে পারতাম গরীব শুধু মুসলমানরা নয় হিন্দুরাও গরীব। গ্রামে গঞ্জে খেতে না পেয়ে হিন্দু বাড়ির শিশু মারা গেলে যে দুঃখ হয়, মুসলমান মায়েরও সে দুঃখ হয়। সুতরাং গরীব মুসলমানরা যদি সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হয়, গরীব হিন্দুরা হবে না কেন। শুধু এটুকু আগুন যদি আমাদের বুকের মধ্যে থাকত, তাহলে এই সব মেনিমুখো দেশদ্রোহীরা কখনই আবার সংরক্ষণের কথা বলার সাহস পেত না।

মুসলমানদের সংরক্ষণ প্রসঙ্গে এক পাড়াতুতো দাদু আতঙ্কিত। বয়স ৯৮ বছর। এককালে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। দাদু বললেন—হ্যাঁগো, এ রাজ্যে মুসলমানদের জন্য নাকি সংরক্ষণ হচ্ছে। আমি বললাম—হ্যাঁ দাদু চেষ্টা চলছে। দাদু বললে নিশ্চয় এ নিয়ে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট-দিদির দল সব এক রা। আমি বললাম—হ্যাঁ। দাদু বললে—বোঝ কান্ড। এদেশে থাকারই যাদের নৈতিক অধিকার নেই তাদের জন্য আবার সংরক্ষণ। বললাম, দাদু ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বললে শোন ভাই—তোমরা দু-ভাই সংসারে একসঙ্গে ছিলে। আমি তো জানি। ভাই কত জ্বালিয়েছে। তবু তুমি কিছু বলনি। তারপর তোমার ভাই তার পাওনা গন্ডা বুঝে নিয়ে আলাদা সংসার করেছে। এখন সে যদি এসে আবার তোমার খবরদারি করে, তোমার সংসারে ভাগ বসাতে চায় তুমি কি করবে ভাই। বললাম তখন বুঝতাম না। এখন বুঝি। এখন জোর করে সংসারে নাক গলাতে এলে মেরে তাড়াবো। দাদু বললেন—তাহলেই বোঝ। মুসলমানরা নিজেদের মতো পাকিস্তান আর বাংলাদেশে আলাদা সংসার করেছে। আমরা কিছু বলিনি, ওরা আলাদা হয়েছে। তাও কিছু বলিনি। এখন আবার যদি আমাদের দেশের সংসারে খবরদারি আর দালালি করতে আসে তাহলে কি করা উচিত? ভেবে দেখো। সময় কম।

'হেট মোদী ব্রিগেড'

(১ পাতার পর)

কাকে বলে তা গুজরাটে হাতেকলমে করে দেখিয়েছেন। কথাটা আমার নয়। দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিরা একযোগে রায় দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। এই শিল্পপতিরা কেউই সঙ্ঘ পরিবার অথবা বিজেপি-র ঘরের লোক নন।

সংবাদমাধ্যম ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দুর্ভাগ্যজনক দাঙ্গার পর থেকেই অন্ধ মোদী-বিরোধিতা শুরু করেছে। অপপ্রচার এমন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে আজ দেশ-বিদেশের মানুষের ধারণা—নরেন্দ্র মোদীই দাঙ্গার প্রধান উসকানিদাতা। এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হয়নি। সংবাদমাধ্যম প্রতিবাদ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের এমন একপেশে ভূমিকার একটি সাম্প্রতিক নমুনা দিচ্ছি। গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি একযোগে প্রচার করেছে যে বিশেষ তদন্ত দল নরেন্দ্র মোদীকে ২১ মার্চ জেরার জন্য তলব করেছে। কিন্তু মোদী জেরার মুখোমুখি হবেন না। এই মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্র এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। বেশ কিছু হিন্দি ও মারাঠি সংবাদপত্র ছাড়া ভারতের প্রথম সারির একটিও ইংরাজি সংবাদপত্র সেই চিঠি প্রকাশ করেনি। পশ্চিমবঙ্গের কোনও একটি সংবাদপত্র চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। মোদী সংবাদমাধ্যমের অপপ্রচারে তথ্যগত 'ভুল' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, সাংবাদিকরা অসত্য কথা লিখতে গিয়ে খেয়াল করেননি যে ২১ মার্চ তারিখটা রবিবার। সরকারি ও বেসরকারি ছুটির দিন। আদালত বন্ধ থাকে। তাই আদালতের নির্দেশে গঠিত কোনও কমিটি, কমিশন অথবা দলও রবিবার স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ রাখে। রবিবার ছুটির দিন আদালতে অথবা আদালতের গড়া কমিটি জেরার জন্য কাউকে তলব করে না। এর থেকেই বোঝা যায় যে দেশে হিন্দু-বিরোধী শক্তি কতটা বেপরোয়া। মিথ্যা, ছলনা ও ষড়যন্ত্র এই তিনটি অস্ত্র দেশের সংবাদমাধ্যম নির্বিচারে প্রয়োগ করে চলেছে। সংবাদমাধ্যম লেখে না যে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে ৫৯ জন করসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য দায়ী জল্লাদদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? সংবাদমাধ্যম চুপ করে থাকে ইন্দিরা হত্যার প্রতিক্রিয়ায় দিল্লিতে তিন হাজার নিরপরাধ শিখকে হত্যার ঘটনায়। তিস্তা শীতলবাদের মতো পাক-প্রেমী স্বেচ্ছাসেবীকে শিখ নিধন দাঙ্গার তদন্ত চেয়ে বিবৃতি দিতে শুনিনি। ভুললে চলবে না যে এই তিস্তার প্ররোচনায় পা' দিয়ে বেস্ট বেকারি মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে জাহিরা শেখকে মুম্বাইয়ের আদালত জেলে পাঠিয়েছিল। এই তিস্তার দাবিতেই বেস্ট বেকারি মামলা গুজরাট থেকে মুম্বাইতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা নেই যে ষড়যন্ত্রকারী কারা। কেনই বা কলকাতার কাগজগুলি বিজন সেতুতে দিন দুপুরে আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীদের পুড়িয়ে হত্যা করলে তদন্ত চায় না। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু হত্যার তদন্ত চায় না। সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের পদত্যাগ দাবি করে না। অথচ সংবাদমাধ্যম গত আট বছর ধরে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ড চাইছে। তার একটাই কারণ, ভারতের মাটিতে হিন্দুরা যেন কোনওদিনই মাথা তুলতে না পারে।

বিচ্ছিন্নতাবাদকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে

(১ পাতার পর)

ব্যবস্থিত ও প্রভাবী শাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৯ সালে সারা দেশে ৬৮ স্থানে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ (আর এস এস ট্রেনিং ক্যাম্প) অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্গে মোট ১৪,৩৭৩ জন শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় যোজনা অনুসারে গত বছর (২০০৯-১০) দেশের ২৫টি বড় শহরে সরসঙ্ঘচালকজীর উপস্থিতিতে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্বজনিক সভা, সরসঙ্ঘচালক প্রণাম (সঙ্ঘের গণবেশ পরিহিত স্বয়ংসেবকদের দ্বারা), সদ্‌ভাবনা বৈঠক এবং সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ প্রভাবী কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—দিল্লী, মহাকোশল এবং কেরলের অনুষ্ঠানের। কেরলে ৯২,০০০ স্বয়ংসেবক গণবেশে উপস্থিত ছিল। সব মিলিয়ে সরসঙ্ঘচালকজীর কার্যক্রমে সারা দেশে দু'লক্ষ ষাট হাজার দু'শ একত্রিশ জন স্বয়ংসেবক গণবেশে উপস্থিত ছিলেন। সদ্‌ভাবনা বৈঠকের মধ্যে ছিল—পন্থ, সম্প্রদায় তথা বিবিধ জাতি-পন্থ প্রমুখদের বৈঠকও। সন্ত-মহাত্মাসহ ৩০০০ জন প্রমুখ ব্যক্তি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতিকে লক্ষ্য রেখে জম্মুতে ১০০০ জন সদ্‌ভাবনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৯টি স্থানে পূজ্য সন্তদের উপস্থিতিতে সদ্‌ভাবনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলন বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিল। নাগপুর, চণ্ডীগড় ও তিরুঅনন্তপুরমে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহাকোশল প্রান্তে কলেজ স্টুডেন্টদের শাখার ব্যাপারে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ওই রাজ্যে মহকুমা অনুসারে বৈঠকে ২০ হাজার কলেজ ছাত্র যোগ দেন। গত ২৯, ৩০, ৩১ জানুয়ারি (২০১০) জববলপুরে মহাকোশল প্রান্ত শিবিরে ৫২ জন অধ্যাপক, ৮০ জন শিক্ষক, ১১৭০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

শোকপ্রস্তাব ছাড়া অন্য দু'টি প্রস্তাবে জম্মু-কাশ্মীরে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে রাষ্ট্রীয় সহমতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং গতবছর অনুষ্ঠিত বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সাফল্যকে স্বাগত জানানো হয়েছে (বিস্তারিত প্রস্তাব-পরের সংখ্যায়)।

সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের দায়িত্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক, উত্তরবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক এবং কলকাতা মহানগর সম্ভাগ প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জীকে দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসাবে নিযুক্তির ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী এবং অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণজী মোতলগ কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। রাজস্থানের ক্ষেত্রীয় প্রচারক সুরেশ চন্দ্র অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ নিযুক্ত হয়েছেন।

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

বস্তি থেকে বহুতল

আগুনে ছারখার সিপিএমের উত্থানের আশা

পার্ক স্ট্রিটের স্টিফেন কোর্টে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল বহু মানুষ। বিতর্ক উঠেছে—এই বাড়ির দু'টি তল বেআইনি-ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ-অভিযোগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন সিপিএমের মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, ফাইন দিয়ে আইনী করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সব তথ্য জানা নেই। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এ দুর্নীতি আছে, মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত করেছেন। এই কলামেই লেখা হয়েছিল মিউটেশন বিভাগে একটি অশুভ চক্র টাকা রোজগার করে চলেছে। শুধু তাই নয়, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট-লাইসেন্স ডিপার্টমেন্ট-হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তদন্ত করা দরকার। বে-আইনী নির্মাণ সম্পর্কে বহু সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন কর্পোরেশনের স্পেশাল অফিসার রমেন চ্যাটার্জি। রমেনবাবু গান্ধীজী'র আত্মীয় অমৃতলাল চ্যাটার্জির পুত্র। রমেনবাবু সিপিএম-এরও সদস্য ছিলেন। তাঁর মতো সৎ অফিসার বিরল। তিনি মধ্য কলকাতার ৪৯নং ওয়ার্ডে এবং ৪৮ নং ওয়ার্ডে রাজনৈতিক দাদাদের বেআইনী নির্মাণ ভাঙার আদেশ দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

কলকাতায় বিগত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি বৃহদাকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটলো। কেউ কেউ বলেন বস্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা? এদিকে গোটা বিবাদী বাগ অঞ্চলে একাধিক জতুগৃহ রয়েছে। ব্যর্থ প্রশাসন। এসব গৃহকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে না।

এইসব অগ্নিকাণ্ডের আগুনে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের ভাবমূর্তির দহন কার্য সমাধা হয়ে গেল। যদিও বিমান বসু ক্যাডারদের উজ্জীবিত করতে বলেছেন, হারার আগে হেরে বসবেন না।

২৮ মার্চ সিপিএম-এর যুব সংগঠন ''বেকারী বিরোধী'' দিবস পালনের তোড়জোড় করছে। এদিনের মিছিল তো হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। কারণ, তিন দশকের অধিক সময়ের রাজ্য শাসনে বসে থেকে নেতা-মন্ত্রীদের পুত্র-কন্যা-পরিজন-স্বজনদের এবং গোষ্ঠীর কর্মীদের রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। এমনকী দলের গরীব, নিচের তলার কর্মীরা হাজারে হাজারে আজও বেকার। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার তুলে নিজেদের শয়তানি ঢাকা যায় না। পার্টির নিচেরতলার কর্মীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ফুটে উঠছে।

পৌর-নির্বাচনের দড়ি টানাটানির খবরে

যাবার আগে যে-খবরটা নাড়া দেয় তা'হল, নকশাল আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কানু সান্যালের আত্মহত্যা। সিপিএম-এর বরদারাজন আত্মহত্যা করেছেন আত্মমর্যাদা রক্ষার কারণে। আর কানুবাবু আত্মহত্যা করলেন—মার্কসবাদ-মাওবাদ-এর আত্মহত্যা দেখে। মার্কসবাদীদের একদা স্বর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিন্ন ভিন্ন। এরপর সিপিএম এবং ৩৬টি নকশালী গোষ্ঠী চীনকে তাদের স্বর্গ বলে মনে করেন। নকশালী গোষ্ঠীরা স্লোগান দিয়েছিল,''চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'' এর অর্থ পরিষ্কার—মাও জে-দং-কে ভারতের চেয়ারম্যান মেনে নিতে তাদের দ্বিধা ছিল না। শোনা যায় আর এক নকশাল নেতা যখন চীনে গেছিলেন (ইতিমধ্যে নকশালরা ২৬টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল।) তখন তাঁকে মাও-জে-দং বলেছিলেন, ''এই স্লোগান দিতে আপনাদের কে বলেছে?'' যাক, কানুবাবুর আত্মহত্যা প্রসঙ্গে কথাটা এসে গেল। সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য নানাস্থানে বক্তৃতায় পার্টিকর্মীদের জীবন-যাপনে কৃচ্ছ্রসাধনের উপদেশ দিচ্ছেন। কৃচ্ছ্রসাধন কাকে বলে সেটা শেখার জন্য কানুবাবুই উদাহরণ—অত্যন্ত গরীবি চালে থাকতেন। শুনেছি আদিবাসীদের মতো সামান্য আহার করতেন। বহু সাংবাদিক তাঁকে সংবাদ করেছিলেন কিন্তু তাঁর দুঃখকষ্ট দেখেননি। সিপিএম-এর বর্তমান নেতৃত্ব তো তাঁকে কোনওভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেননি। অথচ সাংবাদিক হিসাবে জানা আছে কানু সান্যাল ও সৌরেন বসু—নকশাল দলে চলে যাওয়াতে প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন ''এঁদের দু'জনের জন্য কষ্ট হয়।'' কিন্তু সিপিএম যাঁকে তাড়ায়—তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নিস্তার নেই। তাইতো দেখি নৃপেন চক্রবর্তীর মতো নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মীকে মৃত্যুর পর মরণোত্তর সভ্যপদ দেওয়া হলো। নৃপেনবাবুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল জ্যোতি বসুর তীব্র সমালোচনা করার জন্য।

যাক, কানুবাবু আত্মহত্যা করলেন 'রাজনৈতিক হতাশা থেকে'। তাঁর সাধের মাও জে-দং-এর চীনের অবস্থাটা কি? চীনে আজ দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব স্তরে নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার কঠিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের জন্য ৫২টি নির্দেশিকা জারি করেছেন। নির্দেশিকায় কী কী আছে—পার্টি সদস্যরা ঘুষ নিতে পারবেন না। ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের পরিবারের কাউকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন না (হা হতোস্মি! পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-নেতার তো পরিবার-পরিজন-কক্‌াস-নেক্সাস-দের দীয়তাং ভুজ্যতাং করে ফেলেছেন), কোনও লাভজনক সংস্থার সঙ্গে পার্টি সদস্যরা যুক্ত থাকতে পারবেন না (পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের মধ্যে লাভজনক এন জি ও-তে যুক্ত হবার জন্য হুড়োহুড়ি হয়েছিল)। চীনের বর্ষীয়ান নেতা দলের সাংহাই-এর পার্টিপ্রধান চেন লিয়াং উইকে পেনশন ফাণ্ডের টাকা তছরূপ করার দায়ে ১৮ বছরের কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এখন বোধহয় স্পষ্ট হচ্ছে কানুবাবুর রাজনৈতিক হতাশা কেন? তিনি তো ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকেও ভুল বলেছিলেন। সিপিএম-সরকারের লজ্জা হয় না—এক জন আজীবন বিপ্লবীকে নিঃসঙ্গতার সঙ্গে আত্মহত্যার পথেই রাজনৈতিক হতাশার অবসান ঘটাতে হলো! এ-থেকে এটা স্পষ্ট, মার্কসবাদী তত্ত্ব ভোগবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বিশ্ব-কমিউনিস্ট নেতাদের চালচলনে ছিল রাজকীয় ব্যবস্থা। একবার জনৈক সিপিএম সদস্য উপহাস ছলে বলেছিলে কমিউনিস্টরা ভগবান মানে না—পরকালও মানে না—সুতরাং বেপরোয়া—আদর্শ হলো খাও-দাও স্ফুর্তি কর, কালকে তো মরতে হবে! তাই বর্তমানে কমিউনিস্ট নামধারীরা লুঠে নে দু'দিন বইতো নয় নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে লুঠলে হালুয়া স্লোগান চালু করেছে।

সিপিএম তো পার্টির প্রতিটি স্তরে প্রতিটি গণসংগঠনে ধনিক শিক্ষিতদের নেতা করছে। তাইতো সিটুর সর্বভারতীয় সম্পাদক করা হলো তপন সেনকে। তপন সেনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হলো তাঁর পিতা-মাতা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তপনের পিতা বঙ্কিম সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের লড়াইয়ে ছিলেন। কারাবাস করেছিলেন কিন্তু সিপিএম-এ যোগদান করেননি। সিপিএম পত্রিকায় লেখা হয়েছে তপনবাবুও নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন? কত বয়স তপন সেনের? কোনও শ্রমিক-আন্দোলনেও ছিলেন না। খালি ঘরে বসে ইংরাজিতে ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন।

রাজ্য কৃষকসভা-ছাত্র-যুব-শিক্ষক সংগঠন-এ সদস্য সংখ্যা হু-হু করে কমে যাচ্ছে। রাজ্য কৃষক সভায় ২৩ লক্ষ সদস্য সংখ্যা কমে গেছে। ছাত্র-যুব-সংগঠনের সদস্যপদ ভোটার লিস্ট দেখে তৈরি করা হয়। আর সভ্যপদের চাঁদা তোলা তুলে দেওয়া হয়। ঠিক পুরাতন কংগ্রেসি কায়দায়।

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

বাঁধ ভেঙ্গে দাও

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গাঢ় একটুকরো নীল আকাশ। তার বুক চিরে সাঁই সাঁই করে মাঝেমধ্যে এরোপ্লেন উড়ে যাবার শব্দ। এরই নিচে গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা একখণ্ড গ্রাম। সর্বসাধারণের বিদ্যে প্রাইমারী স্কুল অবধি, যে গ্রামের রমণীকুল জিন্দেগীতে পাঠশালার মুখ দেখেনি সেখানে পাইলট কিংবা এয়ারহোস্টেস হবার স্বপ্ন সারাটা জীবনই তো অধরা থেকে যাবার কথা।

কিন্তু না, মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোয় ভাল। কিন্তু পড়াশুনোয় ভাল হলেই তো হবে না। এলেম থাকা চাই। এলেম মানে সরকারি এলেম। কারণ মহারাষ্ট্রের সরকার বাহাদুরের মনে হয়েছে, এয়ারহোস্টেস হতে গেলে মেয়েদের 'শারীরিক আবেদন'-এর প্রয়োজন হয়, জনজাতি মহিলাদের তা নেই। একবিংশ শতাব্দীর বুকে নারীকে পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করার যে রেওয়াজ সারা বিশ্বেই প্রচলিত, ভারতবর্ষও যে সেই 'বিশ্বায়ন'-এর কু-প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। মহারাষ্ট্র সরকারের এইরকম জঘন্য মনোভাবই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। কিন্তু অপলা, গার্গী, মৈত্রেয়ীদের দেশে নারী যে ভোগ্যবস্তু নন সেটাই প্রমাণ করলেন ভারতী। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে পুনে গিয়ে সেখানকার এয়ারহোস্টেস অ্যাকাডেমীতে গিয়ে ভর্তি হলো। তবে এখানে খরচা-পাতিও প্রচুর। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এই পাঠক্রমের জন্য লাখ খানেক করে টাকা দিতে হচ্ছে।

সেলুলয়েডে নন, কিন্তু পেন গ্রামের নতুন নায়িকা ভারতী শীড (মাঝখানে)।

গ্রামের নাম পেন। মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার এই গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই জনজাতি সম্প্রদায়ের। গরুর গাড়ি-ই যাদের কাছে নিতান্তই দুর্লভ, কয়েক আলোকবর্ষ দুরের এরোপ্লেন তাদের কাছে শুধুই অপার বিস্ময়। অবাক চোখে এরোপ্লেন উড়ে যাওয়া দেখত ছোট্ট একটি মেয়ে। নাম ভারতী। পুরো নাম ভারতী শীড। সেই ছোটবেলাতেই কখনও কখনও তার মনে হোত মুক্ত বিহঙ্গীর মতো আমিও যদি উড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কথাতেই আছে, বামন হয়ে চাঁদ হাতে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে নেই। যে গ্রামের

অবশেষে ভারতীয় এয়ারহোস্টেস হবার স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছে। এবং তারপরই টনক নড়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের। জনজাতি উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছে তারা।

পুনশ্চ, মহারাষ্ট্রের পেন গ্রামের কচিকাঁচারা আজও অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, প্লেন উড়ে যাওয়া দেখে। সেইসাথে খুঁজে বেড়ায় ভারতী-কে। পেন গ্রামের আরও অনেক 'ভারতী' হয়তো বা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি, দাঙ্গা

নেতাদের পাপের খেসারত দিচ্ছে বৌদ্ধ-চাকমারা

বাসুদেব পাল॥ সম্প্রতি বাংলাদেশে জাতীয় স্তরে 'জেহাদী সন্ত্রাস' সম্পর্কিত এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন সরকারি নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। তারা দু'দিনের সম্মেলন শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'বাংলাদেশে জেহাদিরা জোট বাঁধছে, টার্গেট করছে।' এই খবরটা কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। যে খবরটা আমাদের দেশের বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যম এড়িয়ে গিয়েছে, তা হলো—আবারও চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার তিনটি ক্ষেত্র—খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবন-এর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসের দীর্ঘসময় ধরে রীতিমতো জাতিগত দাঙ্গা (পড়ুন বৌদ্ধ চাকমা বনাম নববসতি স্থাপনকারী বাঙালী মুসলমান) ঘটে গেছে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, বৌদ্ধ মঠ ও চার্চ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে। জনজাতি বৌদ্ধ চাকমারা দীর্ঘকাল ধরে ওই এলাকায় বসবাস করে আসছে। তারাই সেখানকার ভূমিপুত্র। পাকিস্তানী আমল থেকে তাদেরকে (ভারতে) বিতাড়িত করা, মুসলমান ধর্মে-ধর্মান্তরিত করা অথবা সংখ্যালঘুতে পরিণত করার প্রবল প্রয়াস শুরু হয়েছিল শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদত ও ষড়যন্ত্রে। সরকারি চক্রান্তে চরম অত্যাচারিত হয়ে অনেক নিরীহ চাকমারা চট্টগ্রাম লাগোয়া ভারতবর্ষের মিজোরাম ও ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে চলে আসে। চাকমা জনজাতিদের অন্য একটি গোষ্ঠী শান্তিবাহিনী গঠন করে গেরিলা লড়াই চালাতে থাকে।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারও সেনাবাহিনী নামিয়ে বিদ্রোহ দমন এবং চাকমা বৌদ্ধ দের উচ্ছেদ করে সেই রিক্তস্থানে বহিরাগত বাঙালী মুসলমানদের পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারি কর্মসূচী গ্রহণ করে। মুজিবর রহমান থেকে আরম্ভ করে জিয়াউর রহমান, মহম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়া এবং মুজিবকন্যা হাসিনার আমলেও সেই নীতির কোনও পরিবর্তনই হয়নি। মাঝে কয়েকবছর ত্রিপুরায় ত্রাণশিবির ছিল উচ্ছেদকৃত অত্যাচারে বিতাড়িত চাকমাদের আশ্রয়স্থল। সেখানে অনেকেই নারকীয় পরিবেশে জীবনযাপন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণও করে। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চাকমারা স্বশাসিত জেলার মর্যাদা পেলেও দুঃখের দিন শেষ হয়নি। একরকম জোর করেই তাদেরকে ত্রিপুরার ত্রাণশিবির থেকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল।

২০১০-এ আবারও পুরনো দিন ফিরে এসেছে। বাংলাদেশ তাদের দেশের যে

খালেদা জিয়া

শেখ হাসিনা

কোনও ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেলেও এব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীই দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের এই এলাকায় শত শত বসতবাড়িতে আগুন দেওয়া, বৌদ্ধ মন্দির এবং চার্চ ধ্বংস করার কাজ করেছে। স্থানীয় জনজাতিরা পুনর্বাসন দেওয়া মুসলমানদের প্রদত্ত অধিকারের সমান অধিকার দাবী করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দশদিনের লাগাতার হিংসায় ছজন জনজাতিকে হত্যা করা হয়েছে। নাম—লক্ষ্মীবিজয় চাকমা, লিটন চাকমা, বুদ্ধ বতী চাকমা, ভরত চাকমা, শান্তশীল চাকমা এবং নতুনজয় চাকমা। সংঘর্ষে আনোয়ার হুসেন নামে একজন বাঙালী মুসলমানও মারা গিয়েছে। অনেক দোকান, বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে। উভয়পক্ষে গোলগুলি চলেছে। সেনা নামানো হয়েছে।

এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইট্স্-এর দাবী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলাকালীন সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণহানি ঘটেছে। নিহতদের সংখ্যা নিয়ে সরকারের তরফে কোনও কিছু বলা হয়নি। নতুন দিল্লী ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশী সেনারা জনজাতিদের ৫০০টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতেই বৌদ্ধ মন্দির ও চার্চও পুড়িয়ে দিয়েছে তারাই। হাজার হাজার নিরীহ জনজাতি সংখ্যালঘুরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। দিল্লীতে 'এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস্'-এর ডিরেক্টর সুভাষ চাকমা জানিয়েছেন, তারা জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন। আবেদন করেছেন, কমিশন যেন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে, দোষীদের শাস্তিপ্রদান ও চাকমা-বৌদ্ধ দের পুনর্বাসন বিষয়ে কথা বলে এবং চাপ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের নেতারা দিল্লীতে বসে ভারতভাগ করার সময় অতিরিক্ত সৌজন্য দেখিয়ে হিন্দুপ্রধান (৯০ শতাংশের বেশি) পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে প্রদান করেছিলেন। সেই পাপের খেসারত দিচ্ছে নিরীহ বৌদ্ধ চাকমা জনজাতিরা। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহুদীদের থেকেও জঘন্যতম হিংসা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে তারা। হত্যা, গৃহদাহ, লুটপাট এবং ব্যাপকহারে ধর্ষণের শিকার হয়েছে চাকমা মা-বোনেরা। ভারত নির্বিকার— 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।'

মেঘালয়ে পুলিশ অফিসারই জঙ্গিদের কমাণ্ডার

সংবাদদাতা॥ মেঘালয়ের ডি এস পি পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ। চাম্পিয়ন আর সাংমা নামের ওই পুলিশ অফিসারটি পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলায় মেঘালয় পুলিশের সেকেণ্ড ব্যাটলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যাণ্ডান্ট পদে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি নিখোঁজ হ'ন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এস বি কাকতি জানিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার জন্য তার মাইনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা তার খোঁজ চালাচ্ছি। শোনা গেছে যে, তিনি এক সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছেন।' ওই সন্ত্রাসবাদী দলটির নাম 'গারো ন্যাশন্যাল লিবারেশন আর্মি।' জি এন এল এ-এর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেছেন যে, শ্রী সাংমা বর্তমানে তাদের (জি এন এল এ) কম্যাণ্ডার ইন চীফ্ নিযুক্ত হয়েছেন। ওই অঞ্চলে পুরাতন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী দল হ'ল অচিক ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়র কাউন্সিল এবং লিবারেশন অফ্ অচিক এলিট ফোর্স (এল এ ই এফ)। রাজ্য পুলিশ বর্তমানে জি এন এল এ-কে নজরে রেখেছে। কেননা তারা কয়েকটি পেট্রল পাম্পকে এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবী করে চিঠি দিয়েছে।

লেখকদের জন্য

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — স্বঃ সঃ

নাগাল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্র দিবস

সাংবাদিক সম্মেলনে এন এস সি এন (আই এম) নেতারা।

সংবাদদাতা।। কেন্দ্রই যে নাগা-বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে জিইয়ে রাখছে তার নতুন করে প্রমাণ পাওয়া গেল আরও একবার। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বহুচর্চিত শান্তিবার্তা চালু রাখতে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে রাজধানী দিল্লীতে এসেছিলেন এন এস সি এন (আই এম) নেতৃদ্বয় আইজ্যাক চি স্যু এবং থুংলাঙ্গ মুইভা। প্রতিবারের মতো এবারও তারা নাগাল্যাণ্ড সফরে যান নিজ দলের (সন্ত্রাসবাদী) ক্যাডারদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে এবং নাগা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে উসকে দিতে। একথা ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নেই যে নাগা নেতৃদ্বয় হল্যাণ্ডের আমস্টারর্ডামে থাকেন এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভারতে ভ্রমণ করেন। এবারও তারা ভারত সরকারের অতিথি হিসেবেই ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজটি করে গেলেন। গত ২২ মার্চ নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী ডিমাপুর থেকে চল্লিশ কি.মি. দূরে এন এস সি এন (আই এম)-এর শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ক্যাম্প হেবরন শহরে ৩০ তম নাগা সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয় এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির উদ্যোগে। ওখানেই শ্রী মুইভা ভাষণপ্রসঙ্গে জানিয়ে দেন, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সম্মানজনক সমাধান ছাড়া (পড়ুন বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড ব্যতিরেকে) অন্য কিছুই তাদের কাছে নাগা-সমস্যার সমাধানকল্পে গ্রহণযোগ্য নয়। মুইভা বলেন, কেন্দ্র সরকার এবং 'গভর্ণমেন্ট অফ্ পীপুলস্ রিপাবলিক অফ্ নাগাল্যাণ্ড' (জি পি আর এন) উভয়েই নাগা-সমস্যার সমাধানে দৃঢ়সংকল্প। তিনি এ সময়ে কেন্দ্রে সরকারের আন্তরিক প্রয়াসকে প্রশংসার সুরে সাধুবাদ জানান। তার কথায় কেন্দ্র সরকার নাগা সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট তৎপর। তবে তিনি এও জানান যে, এন এস সি এন (আই-এম) শান্তিবার্তা চলাকালীন নাগাদের ঐতিহাসিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। গত বারো বছর এই শান্তিবার্তা চলছে। বিদ্রোহী নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার ব্যাপারে ক্যাডারদের জানান—ভারতীয় সংবিধানের আওতায় থেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালালেও তারা আগে থেকে কোনও শর্ত মেনে নেবেন না। যদি দেশের নেতারা নাগাদের অধিকার বিষয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন তবেই তারা তাকে স্বাগত জানাবেন। অন্যথায় কোনও সমাধানই গ্রহণযোগ্য বলে তাদের কাছে বিবেচিত নয়। বিদ্রোহী নেতাদের এই হুমকি যেমন কথার কথা নয়, তেমনি ওই নেতারা নাগা জঙ্গিবাদ এবং ভারতীয় সাংবিধানিক সুবিধাবাদ—দুটোই পুরো ভোগ করতে চান।

বিগত দু'দশকে ১২,৬৮৯ কেজি আর ডি এক্স উদ্ধার জম্মু-কাশ্মীরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এক-আধ কেজি নয়, ১২ হাজার ৬৮৯ কেজি আর ডি এক্স উদ্ধার হয়েছে গত বিশ বছরে জম্মু-কাশ্মীর থেকে। আর ডি এক্স শব্দটি সর্বজনশ্রুত, একে বিভিন্ন রাসায়নিকের ককটেল জাতীয় কিছু বলা যেতেই পারে। আধুনিক যুগে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ মারতে আর ডি এক্স নামক সস্তা দামের বিস্ফোরকটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যটি যে অগ্নিস্তূপের ওপর বিরাজমান, এই কথাটি নতুন না হলেও, পরিস্থিতি যে এতটা ভয়াবহ তা পরিসংখ্যান না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। গত বিশ বছরে আর ডি এক্সের পাশাপাশি নিরাপত্তাকর্মীরা ৩১ হাজার ৫৩৩ কিলোগ্রাম অন্য বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে।

মূলত এনকাউন্টার অথবা জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকেই এগুলো উদ্ধার করা হয়। একইসঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ধরা পড়া আই ই ডি (ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসেস)-র সংখ্যা ৫৯৩২। জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের 'টার্গেট' করতে আই ই ডি হলো এক অব্যর্থ নিশানা। এগুলোর পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ৬১ হাজার গ্রেনেড। ১৯৯০ থেকে ২০১০—এই দশ বছরে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ডেরায় হানা দিয়ে ৪৬৬৯টি রকেট উদ্ধার করেছেন নিরাপত্তা-কর্মীরা। এর মধ্যে ২০০০ সালে ৫৫৫টি রকেট উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে বিগত তিন বছরে যথাক্রমে ৭৭, ২৮ ও ১টি রকেট উদ্ধার করা হয়েছে। ৫,৬০০টি অ্যান্টি-পারসোনেল মাইনও উদ্ধার হয়েছে গত ২০ বছরে।

অস্ত্র কিংবা বিস্ফোরক উদ্ধার ছাড়াও বিগত কয়েক বছরে জম্মু-কাশ্মীরে নাশকতার পরিমাণও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২ থেকে এখনও অবধি জঙ্গিরা ২৮টি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০০৫ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ যখন তাঁর শাসনভার গুলাম নবি আজাদের হাতে তুলে দিলেন, সেই বছরই ১৩টি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল জম্মু-কাশ্মীরে। এমনকী আজাদ যখন শপথ নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই কাশ্মীর উপত্যকায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জঙ্গিরা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। এতটা অপমান বোধহয় গুলামের সহ্য হয়নি। সুতরাং দেহের সব রক্তকে মুখে তুলে আনার মতোই স্রেফ গাড়ী-বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারেই যাবতীয়

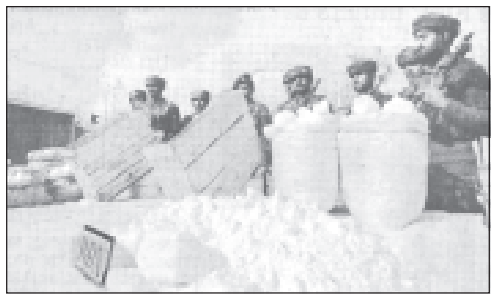

কঠোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। এর ফলে একটা লাভ হলো যে গত কয়েক বছরে গাড়ী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সে রাজ্যে বেশ কমে গেছে। কিন্তু অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্ম বিশেষ করে বিস্ফোরক আমদানী জম্মু ও কাশ্মীরে বিগত বছরগুলোতে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা, ২০০১ পর্যন্ত জঙ্গিরা সেভাবে গাড়ী বোমা ব্যবহার করেনি। কিন্তু এর পরে চার বছর ২০০৫ পর্যন্ত নাশকতা চালানোর মুখ্য উপাদান হিসেবে তারা গাড়ী-বোমার ওপরই ভরসা করেছিল।

জঙ্গিরা যে আর ডি এক্স ব্যবহার করছে তা বোঝা যায় ১৯৯৬ সালে জঙ্গিদের একটা বড় গোষ্ঠী আর ডি এক্স সমেত ধরা পড়ার পরে। এর পরের দীর্ঘ চৌদ্দ বছর শুধুই আর ডি এক্স উদ্ধারের কাহিনী। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো, যে পরিমাণ আর ডি এক্স উদ্ধার হয়েছে, তার বহুগুণ আর ডি এক্স উদ্ধার করা যায়নি এবং সেই উদ্ধার না হওয়া আর ডি এক্স, জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক নিরীহ প্রাণের। জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিবেদন বলছে—"১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সব মিলিয়ে বিস্ফোরণের (আই ই ডি ব্লাস্ট) সংখ্যাটা ৫৬৮৫ এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণের সংখ্যাটা ১১,৮৮২। এর মধ্যে স্রেফ ১৯৯০ সালেই ১২৮০টি আই ই ডি বিস্ফোরণ ও ১৫২৫টি গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রতিবেদনটি শেষ করার আগে অস্ত্র উদ্ধারের খতিয়ানটা একবার দেওয়া যাক—একে-৪৭/৫৬/৭৪ স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ৩৯ লক্ষ রাউণ্ড গুলি, ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৭৫ রাউণ্ড পিস্তলের গুলি, দু'ডজন টেলিস্কোপ রাইফেল, ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৮০ রাউণ্ড ইউ এম জি এবং স্নিফার রাইফেলের ৪৬, ২০১ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে বিগত দু'দশকে।

বিস্ফোরক উদ্ধার (১৯৯০-২০১০)		
	বিস্ফোরকের নাম	পরিমাণ
১	আর ডি এক্স	১২৬৮৯ কেজি
২	অন্যান্য বিস্ফোরক	৩১৫৩৩ কেজি
৩	আই ই ডি	৫৯৩২
৪	গ্রেনেড/হ্যান্ড গ্রেনেড	৬১৭৫৮
৫	রকেট	৪৬৬৯

সবার শিক্ষার অধিকার কার্যকর করতে চলেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৫ মার্চ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিলটি নিয়ে জোরকদমে আসরে নামার কথা ঘোষণা করলেন। শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত সেই বিলে শিশুদের বিনা পয়সায় আবশ্যিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। ২০০৯ সালেই রাজ্য বিধানসভায় এই বিল পাশ হয়। বিলটি কার্যকরী করার ব্যাপারে এবছরের গোড়া থেকেই উদ্যোগ নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। ওইদিন রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশের বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ঠিক হয়েছে, আগামী ১লা এপ্রিল থেকে রাজ্যে মধ্যপ্রদেশ সরকারের 'রাইট টু এডুকেশন' অ্যাক্ট' বিলটির প্রয়োগ কার্যকরী হবে।

তবে সংশ্লিষ্ট বিলটির প্রয়োগ পুরোপুরি কার্যকরী করতে আগামী তিন বছরে অন্তত ১৩ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এপ্রসঙ্গে শিবরাজ বলছেন, "মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষে আগাম তিন বছরে এত কোটি টাকা দেওয়া সম্ভবপর হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য তাই একান্তভাবেই জরুরী।" এবিষয়ে কেন্দ্রের কাছে তাঁর

শিবরাজ সিং চৌহান

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন শিবরাজ। মূলত স্কুল-বিল্ডিং তৈরির ব্যাপারে এবং উন্নত মানের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে কেন্দ্রের কাছে আর্থিক অনুদানের প্রত্যাশী বলে জানিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে পরীক্ষা-বিহীন শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকেও আঙুল তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা-ব্যবস্থা তুলে দিলে তাতে শিক্ষার মানের অবনমনই ঘটবে। শিবরাজ বলছেন, এইভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। বরঞ্চ কম মেধাবী ওইসব ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যাপ্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করে, দরকার হলে অতিরিক্ত যত্ন নিয়েও তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এজন্য প্রথমত চাই ভাল শিক্ষক, তার জন্য দরকার অর্থ। শিবরাজ বলছেন—এবিষয়ে যাবতীয় অর্থ না হয় রাজ্য সরকারই বহন করবে। শিবরাজ সিং চৌহানের স্লোগান এখন —"কাম, লেট আস বিল্ড আওয়ার মধ্যপ্রদেশ"। আর এই স্লোগানে গুরুত্ব পাচ্ছে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' শীর্ষক আপ্তবাক্যটাই। সেই কারণে আবশ্যিক শিক্ষার জন্য নিজের খরচে একগুচ্ছ কর্মসূচী নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শপথ নিচ্ছেন, আগামী জুলাই-এর মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেকটা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার।

আগুনে ছারখার

(৫ পাতার পর)

আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো পশ্চিম মেদিনীপুরে সন্ত্রাস থাকা সত্ত্বেও কৃষক সভার সদস্য সংগ্রহের কোটা পূরণ হয়। রাজ্য কৃষক সভার নেতা তো পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতা তরুণ রায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পার্টির সম্পাদক হলেন দীপক সরকার। দীপক সরকারের বিরোধী-গোষ্ঠীতে অবস্থান তরুণ রায়—তাই তো তরুণ রায় ব্যর্থ হলেন। দীপক সরকার নাকি এ-বঙ্গের পলিটব্যুরো সদস্যদের কাউকেই পছন্দ করেন না। কারণটা খুবই স্পষ্ট। বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম এঁরা রাজনীতিতে দীপকবাবুর থেকে জুনিয়র। আর পার্টি রাজনীতিতে দীপক সরকারও কম বিজ্ঞ নন। সর্বোপরি দীপক সরকার একজন ডাকসাইটে পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে পার্টির হোলটাইমার হন। কাজেই বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-শ্যামল-বিনয়-গৌতম-মৃদুল দে-কে পাত্তা দেবার ব্যক্তি নন দীপক সরকার। দীপক সরকার লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে। আগামী দিনে লক্ষ্মণ শেঠও তাঁকে আটকাবার কৌশল নেবেন। মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ দীপক সরকারের ভক্ত।

তাইতো বলতে হয়, 'অনেক আগুন জ্বালিয়েছো তুমি, এবার এই আগুন তোমাকেই লক্ষ্য করেছে; তাইতো তোমার সিংহাসন পুড়ে ছারখার। তোমরা দেওয়ালের লিখন পড়তে ব্যর্থ।'

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

মোল্লাতন্ত্রে ব্রাত্য মুসলমানী

নবকুমার ভট্টাচার্য

মুসলিম মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আসন সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যসভা, লোকসভায় গলাবাজিতে কোনও দলই পিছিয়ে নেই। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে 'বিধির বাঁধন' ভাঙতে তারা কেউই আগ্রহী নয়। ইন্টারনেটের যুগেও মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করা যায়নি, কন্যা ভ্রূণ হত্যা মুসলিম সমাজে ব্যাপক। ভারতে দশটি মুসলমান প্রধান জেলার মধ্যে পাঁচটি পশ্চিমবঙ্গে। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ চবিবশ পরগণা, মালদা বা বর্ধমানের যে কোনও মুসলিম প্রধান গাঁ-গঞ্জে গেলেই চোখে পড়বে ঘরে ঘরে অপরিণত বুদ্ধির সরলমতি নাবালিকা বধূদের। এইসব নাবালিকা ও কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক গঠন—কোনওটাই পরিণত নয়। যে সমাজের পুরুষ মনে করেন স্ত্রী যেহেতু তার থেকে বয়সে ছোট, তাই তাকে শাসন করার সবটুকু অধিকার তার স্বামীর আছে। যে সমাজে মেয়েদের কোনও স্বাধীনতা ও অধিকার নেই, যে সমাজে স্বামী একাধিক নিকাহ্ করলেও স্ত্রীর কোনও অধিকার নেই তা নিয়ে প্রতিবাদ করার—সে সমাজে মহিলাদের সংরক্ষণ সম্ভব? এই সংরক্ষণের সুযোগ তাকে নিতে দেবে মোল্লারা? সাচার কমিটির রিপোর্ট বলছে, রাজ্যে মোট সাক্ষরতার হার ৬৮.৬ শতাংশ, মুসলমানদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৭.৫ শতাংশ। রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মোট জনসংখ্যার ৮০.৪ শতাংশ আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে ওই সংখ্যাটা ৫০.৬ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশ স্নাতকস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, স্নাতকোত্তর স্তরে সংখ্যাটা মাত্রই ২ শতাংশ। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মুসলমান শিশুদের মধ্যে কোনওদিন স্কুলে যায়নি এমন শিশুর সংখ্যা ২৫ শতাংশ। সরকারি হিসেবেই মাত্র ১৫ শতাংশ মুসলিম মেয়ে স্কুলে যায়। বাকি ২৫ শতাংশ যায় মাদ্রাসায়। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মুসলমান কন্যার মধ্যে কোনদিন স্কুলে যায়নি এমন কন্যা শিশুর সংখ্যা ৬৮.৮ শতাংশ। সমগ্ররাজ্যে হয়তো বছরে ১ বা ২ জন মুসলিম মহিলা স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়। মুসলিম পুরুষেরা মেয়ে শিক্ষায় আগ্রহী নয়, তাদের কাছে মহিলারা হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজে চৌদ্দবছরের আগেই বিয়ে হয় এমন সংখ্যা ৪০ শতাংশ। মুসলমান সমাজে মুসলমান মেয়েদের অবস্থার করুণ কাহিনীর অবসান ঘটানো প্রয়োজন। প্রয়োজন সুষ্ঠু শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। মুসলমান মহিলাদের সঠিকভাবে বৃহত্তর সামাজিক মণ্ডলে নিয়ে আসতে হবে অন্ধকার পর্দার ভেতর থেকে। সম্পূর্ণভাবে টিকাকরণ করানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হার যেখানে ৫২ শতাংশ, মুসলমান পরিবারে জন্ম নেওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে তা মাত্রই ২৪.৫। শিশুদের রক্তাল্পতার বিচারে অন্যান্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনামূলক হার যথাক্রমে ১৬.৭ এবং ৮০.৭ শতাংশ। মহিলাদের রক্তাল্পতা ৫৯ এবং ৬৩ শতাংশ। সন্তান সম্ভবা মায়েরা উপযুক্ত পরিষেবা পান না এরকম ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ০.৭ শতাংশ হলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ৪০ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রবল অনীহা। তালাকের অপব্যবহার অবাধে চলছে। তালাক দেওয়ার সুযোগ যত সহজে মুসলিম পুরুষরা ব্যবহার করছে, ডিভোর্স দেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ পুরুষদের মেলে না। কারণ তালাকে সহজে সহায়তা পাওয়া যায় মৌলবীদের কাছ থেকে।

কলকাতার তিনটি প্রধান রেড লাইট এরিয়ায় মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ। তাই মুসলিম মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের চেয়ে বেশি প্রয়োজন রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের। মোল্লাতন্ত্রের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়া মুসলমান মেয়েরা উদ্ধার না পেলে কিছুই পাওয়া হবে না।

লালু মুলায়মরা মুসলিম মহিলাদের সংরক্ষণ চাইছেন কিন্তু সবথেকে বেশী প্রয়োজন মুসলিম সমাজে পুরুষ নারীর সমানাধিকার। এটা তারা চাইছেন না কেন? মৌলবী উলেমাদের ভয়ে? মৌলবীরা ইতিমধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে ব্যাভিচারের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই মুসলিম মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াশোনা করা চলবে না। উচ্চশিক্ষা তো নয়ই। প্রকাশ্য দিবালোকে বোরখাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দিলেই কি মুসলিম মহিলাদের সমস্যা দূর হবে? দক্ষিণ ২৪ পরগণার হেটো অঞ্চলের এক শিক্ষিতা মহিলার নাম ফরিদা বিবি। তাঁর স্বামী সেই অঞ্চলের কুসংস্কার মুক্ত এক মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর চাকরির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তিনি সেই পদে যোগ দেবেন—এটাই কাম্য এবং তা ঠিকও ছিল। কিন্তু বাধ সাধল স্থানীয় ইমাম মৌলবীর দলবল। তাদের বক্তব্য, যেহেতু ফরিদা নিজেকে কোনও দিনই বোরখার ঘেরাটোপে বন্দি করেননি, তাই সেই পাপ তাঁর স্বামীর শরীরে লেগেছে এবং সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। যেহেতু ফরিদার চাকরি শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল তাই যুক্তি দেওয়া হয়—ফরিদা বোরখা না পরলে তাকে দেখে অন্যান্য মহিলা বালিকা কিশোরীরা বিপথে চালিত হবে। অতএব তাঁর চাকরি রদ করা হলো।

সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর ৫৯টি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ৬৫ শতাংশ মুসলমান সমাজের বাস যে মুর্শিদাবাদে, সেখানে একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি ইমামদের চাপে। মুসলমান সমাজ চায় তাদের ঘরের মেয়েরা রক্ষণশীল এবং বাধ্য থাকুক। তবু পরিসংখ্যান বলছে রক্ষণশীলতার ফাঁক দিয়ে যৌন পল্লীতে সবচেয়ে বেশি চালান করা হয় মুসলিম মেয়েদের। কলকাতার তিনটি প্রধান রেড লাইট এরিয়ায় মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ। তাই মুসলিম মেয়েদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের চেয়ে বেশি প্রয়োজন রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের। মোল্লাতন্ত্রের জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়া মুসলমান মেয়েরা উদ্ধার না পেলে কিছুই পাওয়া হবে না।

সংসদীয় রাজনীতি ও মেয়েরা

অর্ণব নাগ

সংরক্ষণ নামক বিষয়টি যে কখনও দীর্ঘমেয়াদী ফলদায়ক হতে পারে না তা রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ববিদ সকলেই একবাক্যে মেনে নেবেন। তবুও স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে যে সংরক্ষণ নামক যাঁতাকলে আটকা পড়ে গেছে ভারতবর্ষ নামক ১২০ কোটি বহু ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার, একাধিক উপাসনা পদ্ধতির মানুষের একটি দেশ। আজকে ধর্মের ভিত্তিতে (পড়ুন উপাসনা পদ্ধতির নিরীখে) যখন সংরক্ষণের ঘোষণা করে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলি, তখন তাতে সামাজিক প্রয়োজন যতটা না থাকে, তার থেকে বেশি থাকে রাজনীতি। লক্ষ্য করে দেখুন, চাকরিতে মুসলিম সংরক্ষণে বিজেপি বাদে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি যখন এককাট্টা, ঠিক তখনই মহিলা সংরক্ষণে প্রশ্নে সংসদ আড়াআড়িভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর কারণটা সহজবোধ্য। মুসলিম সংরক্ষণের পেছনে মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক অটুট রাখার যে মোক্ষম চালটা ছিল, সেটা কোথাও যেন মহিলা সংরক্ষণে এসে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টার গভীরে গেলে এও দেখা যাবে যে মহিলা বিলকে যেন-তেন-প্রকারেণ রুখতে সেই মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ককেই হাতিয়ার করছেন এই ভোট-ব্যাঙ্কাররা!

বিষয়টা খোলসা করা যাক্। মহিলা বিল নিয়ে কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম এককাট্টা হলেও লালু-মুলায়ম ও মায়াবতী—এই তিন নেতা-নেত্রী এর চূড়ান্ত বিরোধী। এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ তাঁদের দলে যোগ্য মহিলা নেত্রীর অভাব। বিশেষ করে এই তিনটি দলই জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতি করতেই অভ্যস্ত। আর দলিত সম্প্রদায়ের মহিলারা যাঁদের দিন-গুজরান করতেই সারাটা জীবন কেটে গেল, তাদের আর যাই হোক রাজনীতিতে নামার বিলাসিতা মানায় না। এদেশের সংরক্ষণ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এখানেই। সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকর যে স্বপ্ন নিয়ে তপশিলী জাতি-উপজাতিদের সংরক্ষণ চেয়েছিলেন এই বাজারে সেটা নিঃসন্দেহে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। কারণ সুদীর্ঘ ছ'দশক ব্যাপী সংরক্ষণের সুবিধে ভোগ করতে করতে তপশিলীদের একটা অতি ক্ষুদ্রাংশের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আজ ফুরিয়েছে। যেহেতু তাদের আর্থিক পরিস্থিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতায়, সর্বোপরি সামাজিক মানে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে বিগত ছ' দশকে। প্রকারান্তরে তপশিলী জাতি-উপজাতিদের একটা বড় অংশই কিন্তু সংরক্ষণের সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। তারা স্বাধীনতার আগে যে তিমিরে ছিল, এখনও সেই তিমিরেই আছে।

প্রশ্নটা উঠছে ঠিক এখানেই। মহিলাদের সংরক্ষণের সুযোগ স্রেফ ক্ষমতাসীন মহিলারাই ভোগ করবেন না তো? আম-মহিলারা সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় আদৌ পদার্পণ করতে পারবেন তো? দলিত ভোট-ব্যাঙ্ক কিংবা মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক সংগঠিত করার তাগিদে এতদিন ধরে যে রাজনীতিটা চলে এসেছে, মহিলা ভোটব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সেই রাজনীতি করাটা খুব মুশকিল। কারণ মহিলা ভোট-ব্যাঙ্কের হালটা প্রকৃতপক্ষে এদেশের হিন্দু ভোট-ব্যাঙ্কের থেকেও যাচ্ছেতাই ভাবে বহুধাবিভক্ত। প্রথমত, যেটা নিয়ে লালু-মুলায়ম-মায়াবতীরা এমনকী মমতাও রাজনীতি করছেন অর্থাৎ সংরক্ষণের ভেতরে সংরক্ষণ চাইছেন। মহিলা সংরক্ষণ বিলে তাঁরা মুসলিম নারী ও তপশিলী জাতি-উপজাতি রমণীদের জন্য সংরক্ষণ চাইছেন, যা এই 'বহুধাবিভক্ত ভারতীয় নারীসমাজের' জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মাপকাঠিতে একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে 'শ্রেণী-বৈষম্যে'র ব্যাপারটা বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সংসদীয় ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে আর্থিকভাবে ওজনদার কিংবা সম্ভ্রান্ত পিতার কন্যা বা নামী স্বামীর স্ত্রী-রাই এতদিন নির্বাচনে জিতে এসেছেন। যার সবচাইতে বড় প্রমাণ ইন্দিরা গান্ধী, কৃষ্ণা বসু, গীতা মুখার্জীরা। সব নিয়মেরই একটি ব্যতিক্রম থাকে। মমতা কিংবা মায়াবতী সেই নিয়মেরই ব্যতিক্রম মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। সেই কারণে ৫৪৩ জন সদস্যের লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা এখন মাত্র ৫৯। তাও বিগত চোদ্দ বারের তুলনায় এবারেই এত বেশি সংখ্যক মহিলা সংসদে এলেন। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এই অবস্থাটা আরও করুণ। মাত্র তিনজন মুসলিম নারী লোকসভার সদস্যা, রাজ্যসভাতেও এই সংখ্যাটা তিনের বেশি গড়ায়নি। এমনকী, এদেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগুলোতেও মুসলিম মেয়েদের অবস্থা শোচনীয়। সবমিলিয়ে সাতটা রাজ্যে তাদের উপস্থিতি। তাতে বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ১৪ (সারণী দ্রষ্টব্য)।

(এরপর ৯ পাতায়)

সারণী

রাজ্যের নাম	বিধায়ক সংখ্যা	মহিলা বিধায়ক	মুসলিম মহিলা বিধায়ক
উত্তর প্রদেশ	৪০৩	২৭	২
বিহার	২৪৩	২৬	
রাজস্থান	২০০	২৯	৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৯৪	৩৬	
মহারাষ্ট্র	২৮৮	১০	
পাঞ্জাব	১১৭	৮	১
হরিয়ানা	৯০	৯	
তামিলনাড়ু	২৩৪	২৩	১
কেরল	১৪০	৭	১
গুজরাত	১৮২	১৫	
পশ্চিমবঙ্গ	২৯৪	৩৪	৩
ছত্তিশগড়	৯০	১০	
অসম	১২৬	১৩	
নাগাল্যাণ্ড	৬০	০	
মেঘালয়	৬০	১	
মণিপুর	৬০	১	
অরুণাচল প্রদেশ	৬০	২	
ত্রিপুরা	৬০	৩	
কর্ণাটক	২২৪	৫	
ঝাড়খণ্ড	৮১	৮	৩
হিমাচল প্রদেশ	৬৮	৫	
জম্মু-কাশ্মীর	৮৯	৫	

মহিলা সংরক্ষণ বিল

কংগ্রেসের কৌশলী রাজনীতি

তারক সাহা

লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। সেই লক্ষ্যভেদে কংগ্রেস একশোভাগ সফল। লক্ষ্যটা হলো এই যে, মহিলা বিল সংরক্ষণের ঠিক আগেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শরিক দলসহ বিরোধীরা সংসদের ভিতরে বাইরে যেভাবে সোচ্চার ছিল তাতে জল ঢেলে দিতে পারল কংগ্রেস। সুযোগও এল হাতের কাছে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসকে সামনে রেখে দেশের অর্ধেক নির্বাচকদের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে যেভাবে সোনিয়া বিলটা রাজ্যসভায় পাশ করানোর ফাঁদ পাতলেন তাতে বেকায়দায় বিজেপিও। মুশকিল হলো বিজেপি নেতৃত্ব কী করে সোনিয়ার পাতা ফাঁদে পা দিল?

এর আগে মহিলা সংরক্ষণ বিলের উদগাতা ছিল বিজেপি-ই। এখনকার মতো তখনও লালু-মুলায়মের বিরোধিতায় বিলটা পাশ করাতে পারেনি বিজেপি। সুতরাং এই বিলের সমর্থন করাটা যে বিজেপির দায়ের মধ্যে পড়ে সোনিয়া কোম্পানী তা বিলক্ষণ জানত। সিপিএমও যে এর বিরোধিতা করবে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামফ্রন্ট যেভাবে প্রতিদিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বিভিন্ন ইস্যুতে তাও সোনিয়া জানেন এবং সেই সিপিএমের এই বিল সমর্থন যে মমতা ও কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন তৈরি করবে তাও সোনিয়া জানতেন। পরে তাই এই ইস্যুতে মমতাকে অগ্রাহ্য করেই বিলটা রাজ্যসভায় পাশ করানো কৌশলী রাজনীতিরই এক অঙ্গ। কারণ রাজ্যসভায় মমতার সদস্য সংখ্যা মাত্র দুই। তাই বিল পাশের ক্ষেত্রে রাজ্যসভায় সোনিয়ার দুই সখা—বিজেপি আর সিপিএম।

এই মহিলা বিল নিয়ে কংগ্রেসের সুবিধা হলো বহুবিধ। প্রথমত, যেহেতু এটা সংবিধান সংশোধন বিল, সুতরাং এই বিল আইনে পরিণত করতে অর্দ্ধেকের বেশী রাজ্যের সমর্থন চাই। লোকসভায় বিলটি পাশ হলেও রাজ্যগুলি এতে সায় দিত কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দে কংগ্রেস। কারণ এই মুহূর্তে বেশীরভাগ রাজ্যক্ষমতা বিরোধীদের হাতে। সুতরাং সেই মুশকিল নিরসন কীভাবে করবে কংগ্রেস? সুতরাং বিষয়টা সচেতনভাবেই রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে, এই বার্তা মহিলা নির্বাচকদের কাছে পৌঁছে দিল কংগ্রেস এইভাবে যে, মহিলা সংরক্ষণ বিষয়ে কংগ্রেস কতটা ব্যগ্র। অথচ বিরোধীরা এতে বাগড়া দিচ্ছে। সুতরাং এবারে বিলটা যদি লোকসভায় পাশ না হয় তবে কংগ্রেসের হারাবার কিছুই নেই। রাজ্যসভায় বিলটা পাশ করিয়ে লোকসভায় পাশ না করিয়ে আপাতত বিলটা ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে পুরো ফসল ঘরে তুলল কংগ্রেস।

প্রশ্ন হলো, বিজেপি-র তাবড় নেতৃত্ব এই বিষয়টা কেন বুঝলেন না। সিপিএমের না হয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারাও পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের ছায়াসঙ্গী হয়ে বিরোধী জোটে চিড় ধরাতে সচেষ্ট, কিন্তু বিজেপি-র তো তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এত তড়িঘড়ি বিজেপি কেন রাজ্যসভায় বিলটাতে সমর্থন দিল? অন্যত্র বিলটা নিয়ে সপা-বসপার মতো বিজেপির সব সাংসদেরও এতে সায় নেই। বিল নিয়ে ঘর সামলানো দায় এখন বিজেপি-র। সোনিয়া জানেন লোকসভায় বিজেপি-র সব সাংসদের সমর্থন মিলবে না। বিজেপি যখন এর লাভ ঘরে তুলতে পারবে না, কংগ্রেস পুরোপুরি এর লাভ তুলবে তা জেনেও বিজেপি কেন রাজ্যসভায় বিলটা সমর্থন করল তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠছে। তাছাড়া এনডিএ-তেও চিড় ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। শারদ-নীতিশের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কংগ্রেসের নীতিই হলো বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানো।

এমন সোজা-সাপটা লক্ষ্য দেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেও তাবড় বিজেপি নেতৃত্ব কেন বুঝতে পারেন না তা বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয়ত, সোনিয়া মহিলা বিলের কষ্টিপাথরে একবার যাচাই করে নিলেন ইউপিএ, এনডিএ জোট কতটা পোক্ত। মার্শাল দিয়ে সাংসদদের বের করে দেওয়াও সেই কৌশলের অংশমাত্র। মমতাকেও পরখ করে দেখার সুযোগ মিলল তাঁর। সুপ্রীম কোর্টে লালুর বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পদের মামলায় কংগ্রেস লালুর পাশে দাঁড়িয়ে তার উষ্মায় জল ঢেলে দিল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের কুড়িজন সাংসদ রয়েছেন। রাজ্যসভায় দু'জনকে উপেক্ষা করা গেলেও কুড়িজনের সমর্থনকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই লোকসভায় বিল পাশের আগে আলোচনা করে তবেই লোকসভায় বিল পেশ করবে কংগ্রেসের এমন আশ্বাসে সপা-বসপা চুপচাপ।

এই বিল নিয়ে সিপিএম মহলে বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল যখন মমতা সদলে রাজ্যসভা বয়কট করেন। মমতার বেশ গরম গরম কথাও রাজনৈতিক শৈত্যে থাকা সিপিএমকে উষ্ণতা জুগিয়েছিল। কিন্তু ভাবগতিক যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে সোনিয়া-মমতা সখ্যতায় এতটুকু চিড় ধরেনি। কৌশলী রাজনীতিতে বিজেপি-সিপিএম তথা অন্যান্য বিরোধীদের চেয়ে অনেক কদম কংগ্রেস এগিয়ে তা প্রমাণ করল এই মহিলা বিল।

বাজেটের পর এই মহিলা বিল যেমন আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে যাচ্ছে তেমনি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেসকে উত্যক্ত করে তোলার যে বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাতে জল পড়ল। অতএব বিরোধী ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। মানুষ বুঝতে পারল তারা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে জেরবার হলেও দেশের সমস্ত রাজনেতাদের কোনও হেলদোল নেই। অনেকেই বলছে জরুরী বিষয়কে পাশ কাটিয়ে এদেশের সাংসদরা কেবলই তাদের স্বার্থের কথা ভাবে।

এমন পরিস্থিতিতে এ রাজ্যে তৃণমূলেরও বেশ ফায়দা হলো। কোটার মধ্যে কোটা—নতুন এই ফর্মুলায় মুসলিম সংরক্ষণের কথা তৃণমূল বলে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে আরো সুদৃঢ় করার কৌশল নিল। মমতা বিলক্ষণ জানেন দেশের রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি তাতে মহিলা বিল পাশ হওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে আপাতত মমতাকে এ রাজ্যে এগিয়ে রাখল মহিলা বিল। একই সঙ্গে কংগ্রেসকেও।

তাহলে এই বিল নিয়ে কে কোথায় দাঁড়িয়ে? কংগ্রেস কৌশলী রাজনীতিতে একশোয় একশ। বিজেপি একশোয় শূন্য। তৃণমূল এ রাজ্যের নিরীখে একশোয়ে একশ। সিপিএমের অবস্থা বিজেপি-র মতোই। তাদের কংগ্রেস-তৃণমূল চিড় ধরানোর প্রচেষ্টায় জল পড়ল। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে বিরোধী ঐক্যে যেভাবে ফাটল ধরাতে সক্ষম হলো কংগ্রেস তা আবার কবে জুড়বে কে জানে?

সংসদীয় রাজনীতি ও মেয়েরা

(৮ পাতার পর)

মুসলিমদের বাদ দিলেও বাদবাকি অন্য মহিলারাও বিধানসভাগুলোতে সেইভাবে ঠাঁই পাননি (সারণী দ্রষ্টব্য)। যাঁরা ঠাঁই পেয়েছেন সেই চিরাচরিত সম্ভ্রান্ত বাবা বা নামী স্বামীর সূত্র মেনেই তা পেয়েছেন। এর অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বি এস পি-র উমালেশ যাদব। বাদুয়ান জেলার বিসাউলি থেকে নির্বাচিত বিধায়িকা। তাঁর স্বামী (কু)খ্যাত বিধায়ক ডি পি যাদব। কিংবা ধরুন কানপুরের চৌবেপুরের বি এস পি বিধায়িকা প্রতিভা শুক্লার কথা। যাঁর স্বামী প্রাক্তন সাংসদ অনিল শুক্লা ওয়ারসি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখুন তমালিকা পাণ্ডা শেঠ-কে, যাঁর স্বামী হলদিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ (প্রাক্তন!) নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ লক্ষণ শেঠ। আবার অসম গণ পরিষদের নলিন হাজারিকার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী সুশীলা হাজারিকা 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' থিওরি মেনে দেরগাঁও আসনটি দখল করেন।

আবার পাঞ্জাবের শাম চৌরাসি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মহিন্দর কাউর যোশ হলেন প্রাক্তন বিধায়ক গিয়ানী অর্জন সিং যোশের কন্যা। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ মধু বাবারিয়ার পুত্রবধূ ভানুবেন বাবারিয়া নির্বাচিত হয়েছেন রাজকোট (গ্রামীণ) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। সারা ভারতজুড়ে এই একই চিত্রের অবতারণা। ক্ষমতাসীন মেয়েদের ক্ষমতা দখলের আস্ফালন। সাংসদ জুড়ে চিত্রাভিনেত্রী আর পারিবারিক পরিচয়ে দৃপ্ত মহিলাদেরই বেশি চোখে পড়বে।

আলোচ্য নিবন্ধে কেউ কেউ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খোলার একটা আভাস হয়তো পাচ্ছেন, কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই তা নয়। দলিত সমাজকে বঞ্চ না যেমন করছেন ক্ষমতাসীন দলিত অর্থাৎ মায়াবতীরা, যাদবরা যে বঞ্চ নার শিকার হচ্ছেন লালু-মুলায়মের মাধ্যমে, মহিলাদের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটবে না তো? আশঙ্কটাকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এই সংরক্ষণের মধ্যেও যদি দলিত বা মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করতে হয়, তবে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তো বটেই, উপরন্তু দেশের একটা গভীর অসুখ-কেও আমরা সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে পারব। মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ মুসলিম নারীকে যথেচ্ছ সন্তানোৎপাদনের অধিকার দিয়েছে, তালাকের গঞ্জনা শুনিয়েছে, এর বেশি কিছু দিতে পারেনি। আবার দলিত মহিলারাও অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না করে সংরক্ষণের সুবিধে দিয়ে অযোগ্যদের সংসদে আনলে লালু-মুলায়মের ভাঁড়ামির শাকরেদী (শাকরেদ্-এর স্ত্রী লিঙ্গ) ভিন্ন আর কিছু জুটবে বলে মনে হয় না। তাতে বিশ্বের দরবারে ভারতের মস্তকটাই অবনত হবে। সুতরাং মহিলা সংরক্ষণে ভরসা দেশের শিক্ষিতা মেয়েরাই। কিন্তু পিতা বা স্বামীর জোর না থাকলে তাঁরা কতদূর এগোতে পারবেন সেই প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। আরও একটা আশঙ্কা থেকেই যায়, বাবা বা স্বামীর জোরে যারা সংসদীয় ক্ষমতা দখল করছেন, তাঁরা নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নেবেন? আপাতত পনেরো বছরের জন্য করা এই সংরক্ষণ এর উত্তরটা মিলবে বছর পনেরো পরেই। সুতরাং দেশের মেয়েরা এগোচ্ছেন না পেছোচ্ছেন সেটা ২০২৫-এর মধ্যেই পরখ করে নিতে হবে। নইলে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয়ে যাবে।

সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা

নির্বাচনের পূর্ব হইতেই মমতা বন্দোপাধ্যায় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সবার থেকে সর্ববিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক সংখ্যাতত্ত্বে সংখ্যাগুরুরা নেহাতই ছাগলের তৃতীয় বাচ্চায় পরিগণিত। সংখ্যালঘু বলে যাদের আদর করে ডাকা হচ্ছে তারা ভারতবর্ষে হিন্দুদের পরেই বর্তমানে স্থান করে নিয়েছে। যদিও বৌদ্ধ, জৈন্য, শিখরাও এখন নিজেদের সংখ্যালঘু বলে দাবি করতে পারে।

মমতা ব্যানার্জিরা চান মহিলা বিলে মুসলমান মহিলাদের বিষয়টি আলাদা করে ভাবা হোক।

কী পড়াশুনার ক্ষেত্রে, কী চাকুরির ক্ষেত্রে—রাজ্য সরকার, কিংবা কেন্দ্র সরকার সকলেরই ধ্যান জ্ঞান—কি করে সংখ্যালঘুদের তোষণ করা যায়। কারণ একটাই। ভোট বাক্সে নিজ অনুকূলে যাতে ওই সংখ্যালঘুদের আনুকূল্য লাভ করা যায়। দেশের সার্বভৌমত্ব, দেশের শান্তি যাদের দ্বারা বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে, সব রাজনৈতিক দল (বিজেপি বাদে) তাদের অনুগ্রহ পাবার জন্য এত লালায়িত। অর্থাৎ একমাত্র কারণ ব্যালট।

এখনও কি তাদের চেতনার উন্মেষ হয়নি? আফতাব, আফজল গুরু যে দোষে দুষ্ট তাতে প্রাণদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। কিন্তু তা এড়িয়ে গিয়ে ধৃত জঙ্গি, সমাজবিরোধী, উগ্রপন্থীদের রাজার হালে জিইয়ে রাখার নামই কি সংখ্যালঘু তোষণ নয়? যাঁরা উগ্রপন্থী তারা সকলেই যে সংখ্যালঘু একথা আজ নিশ্চয় বলার প্রয়োজন নেই।

এভাবে সংখ্যালঘু তোষণ, সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ করতে করতে হিন্দুভোট যদি মমতার পক্ষে না গিয়ে বিভাজন হয়ে যায় তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে কেরলে সংখ্যালঘু তোষণ, সংরক্ষণের মাত্রা এত ন্যক্কারজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যাতে করে উত্তরোত্তর হিন্দুভোট কেটে যাচ্ছিল বাম দলের পাশ থেকে। অনেক দেরীতে হলেও তারা দেখেছে সংখ্যালঘু প্রীতির জন্য অনেক হিন্দুভোট কেটে যাচ্ছে। তা দেখে বামদলের সম্বিত ফিরেছে। তাই এবার নির্বাচনে তারা ঠিক করেছে মুসলীম লীগের সাথে আর গাঁটছড়া নয়।

এটা কি মমতা ব্যানার্জিরা বুঝতে পারছেন না। সংখ্যালঘুদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে দিতে দেশটাকে উগ্রপন্থী, জঙ্গি আর সমাজবিরোধীতে ভরে তুলবেন না। কারণ মনে রাখা উচিৎ আমেরিকা নিজ স্বার্থে লাদেনকে সৃষ্টি করেছিলো, ইন্দিরা গান্ধীর তৈরি ভিন্দ্রেনওয়ালাও একদিন ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। একপ্রকার অস্ত্র আছে যা লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে আবার নিক্ষেপকারীর নিকট ঘিরে আসে। তাঁর নাম ব্যুমেরাং। এরাও না ব্যুমেরাং-এ পরিণত হয়। সকল রাজনৈতিক দলকে সামান্য অনুরোধ—কোনও সম্প্রদায়কে তোল্লা দেবেন না, দেখা যাক না সংখ্যালঘুরা কাকে কোথায় ভোট দেয়।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী-বর্ধমান।

সুখের পায়রা

পাহাড়ে ধস নেমেছে। পাহাড়ে ধস নামলে বা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে ওই পাহাড়ে বসবাসকারী প্রাণীরা পাহাড় ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক লোকসভা উপনির্বাচনে লক্ষ্য করা গেল ৩৩ বছরের সিপিএম নামক অচলায়তনে ধস্ নামতে শুরু হয়েছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সিপিএম আশ্রিত শ্বাপদ সকল। সিপিএম-এর স্নেহচ্ছায়ায় থেকে তারা এতদিন যে সমস্ত কাজকর্ম করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছিল—অর্থাৎ জলাজমি ভরাট, প্রমোটারি ব্যবসা, বালি, সিমেন্ট, স্টোনচিপস্ প্রভৃতি সরবরাহ করা এবং তোলাবাজি প্রভৃতি;তা আর চলবে না। কারণ রাজনৈতিক দাদাদের প্রশ্রয় এবং প্রশাসনিক কর্তাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং পুলিশের পরোক্ষ মদতে এতদিন যা চলছিল সিপিএম প্রশাসনিক ক্ষমতাচ্যুত হলে তা আর চলবে না। অধিকন্তু, নতুন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। অতএব সময় থাকতে থাকতেই ব্যবস্থা নেওয়া ভাল। তাই দলত্যাগের একটা হিড়িক পড়ে গেছে। সিপিএম-এর স্থানীয় নেতারা দলবল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। কংগ্রেসীরাও দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখাচ্ছে।

সাম্প্রতিক, নির্বাচনের পর হঠাৎ এ ধরনের ঘটনার সংখ্যাধিক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি? রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে বলা যায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-এর পক্ষে সরকারি প্রশাসনিক ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল হাওয়া বইছে। অতএব সময় থাকতে থাকতেই সিপিএম ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়ে যাওয়াই বুদ্ধি মানের কাজ। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকে 'করে কম্মে' খাওয়া যাবে। দাদাগিরি, তোলাবাজি, জলাজমি ভরাট করা, বালি, ইট, সিমেন্ট, পাথর সরবরাহ, যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে। শুধু প্রণামীটা এদিকে নয়, ওদিকে দিতে হবে। তাই বেনোজল ঢুকে তৃণমূল কংগেস ক্রমশঃই ফুলে ফেঁপে উঠছে। কানকাটা কালু, গালকাটা লালু, সবাই তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়ছে। "করে-কম্মে খেতে হবে তো। তবে হার্মাদ বাহিনীর যারা সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বোমা বন্দুক নিয়ে "বিপ্লব" করেছিল তারা আপাতত কংগ্রেস নাম লেখাচ্ছে। পরে সুযোগ সুবিধে মতো তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়ে যাবে। ফলে দেখা যাবে অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকছে। স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, পাইয়ে দেওয়া, "করে কম্মে খাওয়া" প্রভৃতি একই রকম থাকছে। অধিকন্তু দিদির অত্যধিক মুসলিম প্রীতির কারণে সরকারি চাকরি, শিক্ষা, ব্যাঙ্ক লোন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানরাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি বলতে পারেন দেশের সম্পদের ওপর মুসলমানদের প্রধান অধিকার, তাহলে তার মন্ত্রীসভার কোনও মন্ত্রী, মুসলমানদের জন্য তখন জান লড়িয়ে দেবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর, হুগলী।

প্রসঙ্গ ঃ নেতাজী

২৫ জানুয়ারি তারিখে স্বস্তিকায় প্রকাশিত "নতুন তথ্য নতুন আলোকে নেতাজীর অন্তর্ধান" লেখাটি পাঠকদের উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। নেতাজী ফিরে আসবেন গবেষিকা বিশ্বাস করেন না। কিসের ভিত্তিতে উনি এই বিশ্বাস পোষণ করছেন? কি কারণ? উনি বলেছেন শেষটা ওখানেই হয়েছে এবং শেষ উত্তর ওরাই (রাশিয়া) দিবে। এই শেষটা বলতে উনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ধরে নিতে পারি নেতাজী রাশিয়াতেই শেষ হয়েছেন! শেষ উত্তরটা কী হতে পারে? নেতাজী বিষয়ক "টপ সিক্রেট" কয়েকটি ফাইল রাশিয়ার মহাফেজখানায় আছে, ভারত সরকার চাইলে সরকারিভাবে রাশিয়া দেখাতে রাজী আছে। গবেষিকা কি সেই ফাইলগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন? ভারতের মহাফেজ থানায় অনুরূপ "টপ সিক্রেট" ফাইল আছে যা মুখার্জী কমিশনকে দেখতে দেওয়া হয় নাই। সরকারের বক্তব্য সেই ফাইলের বিষয়বস্তু প্রকাশ হলে "বন্ধু রাষ্ট্রে"র সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। ওই "বন্ধু" রাষ্ট্রগুলো কোন্ রাষ্ট্র?

মৌখিক ইতিহাস হলেও সত্য "জহরলাল নেহেরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে নেতাজীর দেখা হয়েছিল"। কোনও এক জনসভায় সেই তথ্য বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন— নেহরু তা করতে দেন নাই। নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর বৃটিশ ও আমেরিকাকে নেহরু লিখিত জানিয়েছিলেন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। প্রথম প্রশ্নের জের টেনে বলাই যায় শেষটা যদি ওখানেই হয়ে থাকে তবে। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেতাজীকে হত্যা করা হয়েছে— গবেষিকার মতামত কী? তারপর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক চুক্তি হয়, এবং ভারত বেশি করে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকেছিল। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর সহিত নেতাজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল তা আমি কোন বই-এ পাই নাই।

"রেনকোজির মন্দিরের ভস্ম" মানুষের ভস্ম নয়। দুঁদে-মার্কিন গোয়েন্দারা পরীক্ষা করে দেখেছেন—ওটা কোন জন্তুর ভস্ম।

স্ট্যালিন নেতাজীকে আটকে রেখে ভারতকে চাপে রেখেছিলেন এবং অস্ত্র কিনতে বাধ্য করেছিলেন।

নেতাজীর কারণেই বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল, তাই বৃটিশ বা মিত্র শক্তি চায়নি নেতাজী ফিরে এসে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করুক। নেহরু তথা কংগ্রেস পার্টী মনে প্রাণে চাচ্ছেন না চায়নি নেতাজী ফিরে আসুক। এখানে গদী হারানোর ভয়ই বেশি।

—অনিল চন্দ্র শর্মা, কোচবিহার।

হিন্দুদের বদনামের চক্রান্ত

অতি সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদমাধ্যম হিন্দু-সন্তদের বদনাম প্রচারে অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছে। 'ব্রেকিং-নিউজ' করা হচ্ছে হিন্দুদের চরিত্র, হনন। এগুলি কতটা সত্য তা সময়ই বলতে পারবে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিগত কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ২০০৩-২০০৪ সালের তহলকা ভিডিও, সঞ্জয় যোশীর মতো বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে যৌন-কেলেঙ্কারীর ভিডিও টেপ সেই সময় সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে 'হটকেক' তৈরি হয়েছিল। এছাড়া কিছুদিন পূর্বে 'আরুষি হত্যা' মামলার সংবাদমাধ্যম তার বাবাকেই খুনী বলে প্রচার করেছিল। সংবাদপত্র পড়ে আর টিভি চ্যানেলের প্রচারিত ফুটেজ দেখে সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন সেই সমস্ত তথ্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে তদন্তে দেখা যায় প্রত্যেকটি অভিযোগই মিথ্যা। কিন্তু সেই তথ্য কয়টি সংবাদপত্র বা টেলিভিশন পর্দায় দেখানো হয়েছে? কোথাও এই পূর্বের অপপ্রচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করা হয়নি।

সুতরাং বর্তমানে যে ধরনের অপপ্রচার হচ্ছে তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই প্রদর্শন কি শুধুই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্বলিত, চ্যানেল হিট করানোর জন্য? শুধু হিন্দু সমাজের প্রতি এদের এতো আক্রোশ কেন? মুসলিম বা খৃষ্টান ধর্মগুরুদের সকলেই ধোয়া-তুলসীপাতা? তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রচার নেই কেন? এগুলির একটিই উত্তর— 'বিদেশী পুঁজি', যা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমকে। এদের উদ্দেশ্য একটাই— ধর্মান্তরকরণ।

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

রামনবমী উদযাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দুর্গাপুরে দক্ষিণ প্রখণ্ড শাখার উদ্যোগে রামনবমী উৎসব পালিত হলো। পূজা, যজ্ঞ, রামচরিত মানস

পাঠ, রামনাম সংকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এস.বি. মোড়ের কাছে বিশাল মণ্ডপে রামনবমী পালিত হয়। হাজার হাজার ভক্ত ও দুর্গাপুর শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আসানসোল জেলা সম্পর্ক প্রমুখ যুগলকিশোর সিং রামচরিত মানস পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া আর. এস. এসের আসানসোল জেলা সহ কার্যবাহ নিরঞ্জন মাকুড় এবং বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের তারকদাস সরকার উপস্থিত দিলেন। ২৫ মার্চ বিকালে বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন

গত ১৮ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বরুইডাঙ্গা গ্রামে আদিবাসী আশ্রমে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে পরাবর্তন হয়ে গেল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সহঃ সম্পাদক হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে ১৩টি পরিবারের ৩৩ জন বনবাসী ভাই খৃষ্টান থেকে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘরে ফেরা শান্তি মর্মুর কথায়, এক সময়ে আমরা টাকা পয়সার প্রলোভনে সাঁওতাল থেকে খৃষ্টান হয়ে গিয়ছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলাম আমরা ফের আমাদের দেব-দেবীর পূজা করতে পারব না—আমার মারাংবুরু (শিব) -এর উপাসনা করতে পারব না। তার জন্য আমরা আবার হিন্দুধর্মে চলে এলাম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই দিন হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ ৭০ জন ভক্তকে দীক্ষা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান। ৩৩ জন বনবাসীকে নতুন বস্ত্র দান করা হয় এবং তারপর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিকদের নিয়ে সহ ভোজে অংশগ্রহণ করেন। বনবাসীরা স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করে খুব খুশি।

বর্ষ প্রতিপদ উৎসব

গত ১৬ মার্চ শিলিগুড়ি সঙ্ঘ কার্যালয় 'মাধব ভবনে' বর্ষ প্রতিপদ উৎসব বিশ্ব হিন্দু

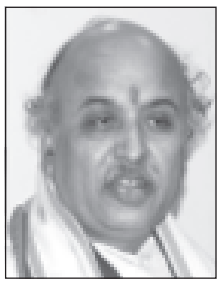

পরিষদের আন্তর্জাতিক যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়ার উপস্থিতিতে পালিত হলো। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতীয় কাল

সমাবেশ সমাচার

গণনার বৈজ্ঞানিক দিক বিশ্লেষণের সাথে ইসলাম ও খ্রীষ্টান মতবাদের তুলনা করে হিন্দুদের ধর্মের আধারে শাখা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগঠিত হবার আহ্বান জানান। উৎসবে ১২০ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গল নিধি

গত ১৪ মার্চ কালিম্পং জেলা কার্যবাহ সমীর ঘোষের বিবাহ উপলক্ষে তাঁর পিতা কুবের ঘোষ মঙ্গলনিধি স্বরূপ ৩০০১ টাকা দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিকিম বিভাগ প্রচারক বাদল দাস এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়।

শোক সংবাদ

উত্তর দিনাজপুর জেলার দানগ্রামের পুরাতন স্বয়ংসেবক (একদা জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ দায়িত্বপ্রাপ্ত) সত্যব্রত চৌধুরীর মাতৃদেবী ঁমানকুমারী চৌধুরী গত ১২ মার্চ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৪ পুত্র এবং ১ কন্যা সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

গাজন একটি কৃষিভিত্তিক আদিম সমাজের উৎসব

নির্মল কর।। বাংলার লৌকিক জীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা শিবঠাকুর। গাঁয়ে গঞ্জে তাঁর থান(থানে থানে শিবমন্দির, থানে থানে উপাসকদের ভিড়। পণ্ডিতেরা বলেন, শিব উপাসনা শু(হয়েছিল মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগে। তারপর আজ পর্যন্ত যুগে যুগে

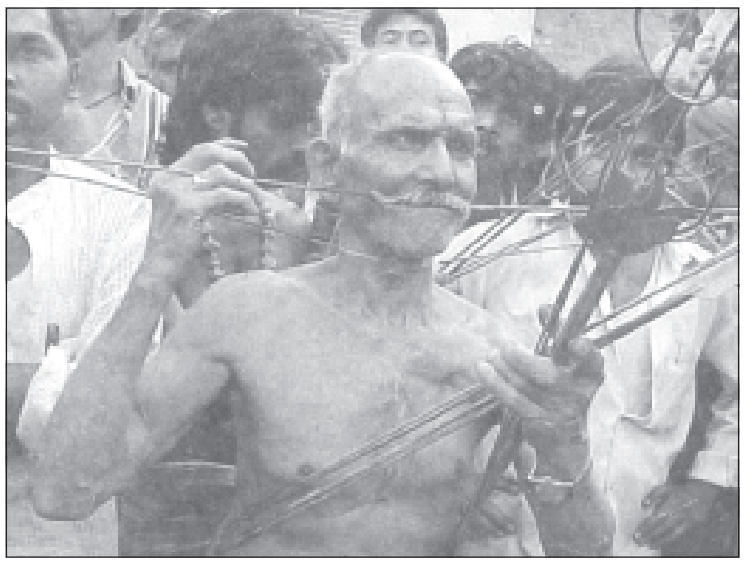

বাঙালিরা তাঁর আরাধনা করে আসছে। একদা গাজন ও চড়ক ছিল রাঢ় বাংলার একান্ত উৎসব। ত্র(মে রাঢ়ভূমি ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলা ও বাংলার সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে এই উৎসব। পথেঘাটে, নদীতীরে ভক্ত(রা লিঙ্গে(র শিবকে প্রতিষ্ঠা করে অভিলাষ পূরণের আশায় মানত করে, উপোস দেয়, বারব্রত করে। তাঁকে নিয়ে গান বাঁধে, ছড়া কাটে, নাচে গানে উন্মত্ত হয়। কারণ, এখানে 'শিব ছাড়া গীত নেই'—'ধান ভানতেও শিবের গীত' গাইতে হয়।

শিব-সাধনার সবচেয়ে বড় উৎসব 'গাজন'। চৈত্র সংক্র(ান্তি যত এগিয়ে আসে, গাঁ-গঞ্জে চড়ক-গাজনের প্রস্তুতি শু(হয়ে যায়। পয়লা চৈত্র থেকেই ভক্ত(্যদের গাজনতলায় যাতায়াত। তারা বিচিত্র কৃত্যে মেতে ওঠে, মন্ত্র পড়ে, শিব-গোত্র নেয়। এদের কাঁধে পৈতে, হাতে বেত গাছা, পরণে গে(য়া পোশাক। ঢাক বাজিয়ে 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে।

গাজনে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকে(বাকিরা কিন্তু সন্ন্যাসী নয়, এরা গাজন-সন্ন্যাসী বা ভক্ত(্যা। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে ভক্ত(্যা সংগ্রহ করা হয়। পুরো চৈত্রমাস এরা সন্ন্যাসীর মতনই শুদ্ধ জীবন-যাপন করে। দ্বারে দ্বারে মাধুকরী সংগ্রহ করে। সেই ভি(ালব্ধ বস্তু দিয়ে দিনশেষে হবিষ্যি করে। মাসের শেষে নানা কৃচ্ছ্রসাধন করে। দণ্ডী খাটে, বাণ ফোঁড়ে, হিন্দোলে ঝোলে, আগুন-সন্ন্যাস করে, ধুনুচি পোড়ায়। পাটে চড়ে, চড়কে ঘোরে। রাঢ় বাংলায় ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা সিঁদুরমাখা মড়ার খুলি নিয়ে রাতভর নাচে, কোথাও সঙ সাজে। বাজনা বাজিয়ে 'গাজনের সন্ন্যাসী চলে নাচিয়া নাচিয়া/ঝাঁপ দিতে আজি মরণের...।'

গাজন ও চড়ক শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং গাজনের উপাস্য দেবতাকে নিয়ে নানা জনের নানা মত। অনেকে মনে করেন, শিবের উৎসবে সন্ন্যাসীদের উচ্চ শিবধ্বনি নৃত্যগীত ও নাদ-নিনাদের সম্মিলিত কোলাহলের নাম গাজন। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি গাজনকে হর-কালীর বিবাহ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, গাজনের সন্ন্যাসীরা হলেন এই বিয়ের বরযাত্রী। তাদের গর্জন বা গুঞ্জন থেকে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি। অন্যমতে গ্রামের 'গা' ও 'জন' বা জনসাধারণ থেকে গাজন শব্দের উৎস। অর্থাৎ গ্রাম্য জনোৎসবই-গাজন। আর গাজনের আনুষঙ্গিক উৎসব হলো চড়ক। চড়ক-এর উৎপত্তি 'চত্র(' শব্দ থেকে। গাজনের সন্ন্যাসীরা হরগৌরীর সঙ সেজে, কেউ কেউ নন্দীভৃঙ্গী ভূত-পিশাচের সঙ সেজে রং-তামাশা করতে করতে, দশলকি ফুঁড়ে নেচে নেচে পথ-পরিত্র(মা ক'রে শেষে গাজনতলায় সমবেত হয়। বাণফোঁড়া সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ চড়কগাছে চড়ে মহাশূন্য পরিত্র(মা করে। এককালে কলকাতার বাবুসমাজও নানাস্থানে শিবালয় প্রতিষ্ঠা করে গাজন করতেন, চড়কগাছ পুঁতে সন্ন্যাসী ঘুরিয়ে আমোদ পেতেন।

এক এক জায়গায় গাজনের এক এক নাম, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। চড়কের মূল পুজো বা উৎসব সূর্যদেবকে নিয়ে। সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকে সূর্যকে মানুষ উপাস্য হিসেবে মেনে এসেছে। সূর্যকে পু(ষ বা পিতৃশক্তি(এবং ধরিত্রীকে মাতৃশক্তি(র প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য ও পৃথিবীর আবর্তনে ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর মেলবন্ধন ও বিবাহের ফলে পৃথিবী 'শস্যপূর্ণ' হয়। দ্বাদশ রাশির পরে সূর্যের একবার পরিভ্রমণ শেষ হলে অর্থাৎ চৈত্র সংক্র(ান্তির সময় সূর্যের সঙ্গে ধরিত্রীর প্রতিবছর বিবাহ বা বৎসরান্তে সূর্য ও পৃথিবীর স্মরণে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদিম সমাজের বি(্বাস, চৈত্রমাস থেকে বর্ষার প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে, তখন সূর্যের তেজ প্রশমন এবং তাঁর সুদৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিজীবী আদিম সমাজ এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে গ্রাম্য শিবমন্দিরকে আশ্রয় করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মানুষ মনস্কামনা পুরণের জন্য শিবের উদ্দেশে বিভিন্ন ধর্মাচরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন করে। ভারী গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে উদ্বিগ্ন কৃষকসমাজ প্রার্থনা জানায় বর্ষার আগমন ত্বরান্বিত হোক, ধরিত্রী শস্যশ্যামলা হয়ে উঠুক। সারা চৈত্রমাস ধরে চলে ধর্মাচরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন। গাজনের অন্যতম অনুষঙ্গ এই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে রয়েছে নানারকম আত্মপীড়ন বা শারীরিক নিগ্রহ। কাঁটাযুক্ত(বিছানো গাছের ডালে হাঁটাহাঁটি বা গড়াগড়ি দেওয়া, ধারালো অস্ত্র বা বঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, জিভে বাণ বিদ্ধ করা, পিঠে বড়শি ফুঁড়ে চড়কি কাটা, আগুনে ঝাঁপানো বা আগুন সন্ন্যাসের মতো আত্মপীড়নের উদ্দেশ্য একটাই, শিবকে তুষ্ট করা। শিবও ভক্ত(্যাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বিগত শতাব্দীর গাজনের বিপজ্জনক ধর্মাচারগুলি আইন করে নিষিদ্ধ করা হলেও আজও অল্পবিস্তর সব আচার অনুষ্ঠানই অব্যাহত আছে। এসব আদিম যাদু-বি(্বাস শুধু চড়ক গাজনে বা শুধু হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানেই নয়, এমন ধর্মাচার অনুসরণ দেখা যায় অন্য ধর্মেও এমনকী বিদেশেও। গাজনের অনুষ্ঠানে রক্ত(পাত, মড়াখেলা ও শবদেহ নিয়ে নাচানাচি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লোকভাবনায় রক্ত(উর্বরতার প্রতীক। গাজনে কৃচ্ছ্রসাধন এবং রক্ত(পাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর উর্বরতা বৃদ্ধির আকুতিই প্রকাশ পায়।

স্ব-জাতে বিয়ে হলে বেশিদিন টিকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লিভ-টুগেদারের থেকে বিয়ে করলে বেশিদিন টেকে এতো জানা কথাই। কিন্তু বেজাতে বিয়ে হওয়ার থেকে একই জাতে অর্থাৎ স্ববর্ণে বিয়ে হওয়া যে বেশি কার্যকরী—আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের এক সাম্প্রতিকতম সমীক্ষায় এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। এই সমীক্ষায় আরও জানা গেছে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসরণ করে অষ্টকূট মিলিয়ে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ দিলে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম।

দেখা গেছে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে ৭৮ শতাংশেরই বিয়ে টিকেছে পাঁচ বছরেরও বেশি। লিভিং টুগেদারে সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। একসঙ্গে খুব বেশিদিন অর্থাৎ পাঁচ বছরেরও কম থেকেছেন ৩০ শতাংশ লিভ টুগেদার করা দম্পতি। বস্তুত ভারতীয় সমাজে এবং শাস্ত্র অনুসারে লিভ টুগেদার ব্যভিচার মাত্র। এতে জীবন সুখের হতে পারে না। ২০০২ সালে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল বিবাহিত ও অবিবাহিত দম্পতিদের ওপর। বয়ঃসীমা ১৫ থেকে ৪৪ বছর। দেখা গিয়েছে এঁদের মধ্যে ৪০ শতাংশই বিবাহিত। আর মাত্র ৯ শতাংশ অবিবাহিত, লিভ-টুগেদারে বিশ্বাসী।

এই সমীক্ষার সবচেয়ে মজার কথা হলো—২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যাঁরা একসঙ্গে ঘর করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই স্বজাতে বিয়ে করেছেন। শুধু তাই নয়, এঁদের প্রত্যেকেরই বিয়ের আট মাসের মধ্যে প্রথম সন্তান সম্ভাবনা ঘটেছে। বস্তুত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ রয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দনও এই মতের সমর্থক। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে—যাঁরা বেজাতে বিয়ে করেছেন তাঁরাই বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারেননি। এঁদের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমন দম্পতির সংখ্যাই বেশি— ৬৯ শতাংশ। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভারতীয় রাশি লগ্ন গণ মিলিয়ে স্ববর্ণে বিবাহ পদ্ধতিই বেশী টিকেছে।

আমার নাম খান.... কিন্তু আমি মুসলিম নই'

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য-পরম্পরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী মানুষের বাস আমাদের এই ভারতবর্ষে, কিন্তু ধর্ম (জীবনধারা) একটাই। সেটা সনাতন হিন্দু ধর্ম। যার সবচাইতে বড় প্রমাণ গুজরাটের পালানপুর। এখানকার অধিকাংশ মানুষই উপাসনা পদ্ধতির দিক থেকে মুসলিম। অথচ সেখানকার লোকেরা চামুণ্ডা মাতার পুজো করেন, হিন্দু রীতি-নীতি মেনে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়, পরিবারে কারোর মৃত্যু ঘটলে হিন্দু নিয়ম-নিষ্ঠা অনুসারে যে চল্লিশ ব্যবস্থা রয়েছে তা তাঁরা বিধিবৎ মানেন। শুধু আপাত বিসদৃশ ঠেকে যখন জানা যায় যে তাদের পদবী 'খান'। একজন মুসলমান হয়ে কাফেরের রীতি-নীতিকে এভাবে মেনে চলা আর.এস.এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের বক্তব্যকেই প্রতিধ্বনিত করে—'ভারতবাসী মাত্রই হিন্দু'।

বানসকথা জেলার চারটি গ্রামে চুরানববইটি পরিবারের সদস্যরা যেমন সারফারাজ, করিম, ইউসুফ, নাসির, রাশিদ, উসমান, শেরখান, মহম্মদ, ইয়াকুবখান, জাফরখান-রা প্রত্যেকেই মুসলিম হলেও হিন্দু আচার-আচরণকে বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে চলেন। এমনকী এই অঞ্চলের মহিলাদের নামও হিন্দুদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে রমিলা, সবিতার মতো পরিচিত হিন্দু নাম।

বত্রিশ বছর বয়সী জাফর খানের মতে, এই পরম্পরা সাধারণত এসেছে মূলী রাজ্য থেকে। রাজা সুলতান মহম্মদ বেগদা ১৪৫৯ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ১৫১১ খৃঃ পূর্বাব্দ অবধি গুজরাটে শাসন করেন। মূলীর রাজপুত বংশজাত রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। যার ফলে তাঁরা বেগদা উপাধি থেকে চ্যুত হন এবং 'খান' উপাধি গ্রহণ করেন।

পঞ্চান্ন বছর বয়সী আব্দুল শেরখানের কথায় তাদের পরিবারের কুলদেবী চামুণ্ডা মা। তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় হিন্দু রীতি-নীতি মেনে এমনকী তাদের ভাষা না গুজরাটী, না হিন্দী। তাদের একরকম আঞ্চলিক ভাষা আছে। যা কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মানুষরাই বুঝতে পারেন। আব্দুলের ঠাকুরদার ঠাকুরদা প্রাক্ স্বাধীনতার সময় মূলী রাজ্য ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় তারা পালানপুরে ফিরে চলে আসেন এবং সেখানকার নবাবের কৃপায় তাদের জন্য চণ্ডীসার এবং ভাসান নামক দুটি গ্রাম তৈরি হয়।

বর্তমানে মোট পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করেন চণ্ডীসার গ্রামে। যার দূরত্ব পালানপুর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার। ধাঁধা গ্রামের খুব কাছে ভাসান। ভাসান গ্রামের মোট পরিবারের সংখ্যা চল্লিশটি। আব্দুল বলছেন, তাদের পরিবারে প্রথানুযায়ী শিশুদের মুসলিম নামই দেওয়া হয়। জাফরের বক্তব্য, 'আমরা একথা বলতে পারি না যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এসব রীতি নীতি মেনে চলবে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে পারি তাদেরকে হিন্দু রীতি- নীতিতে বেঁধে রাখবার। আমাদের সম্প্রদায়ে শিশুদের নামকরণ তাদের মামা করে থাকেন। পরিবারের বড়দের সঙ্গে আলোচনা করেই এই নামকরণ করা হয়।'

রাজপুত 'খানরা' মনে করছেন তাদের সম্প্রদায়ে একে অপরের প্রতি হৃদ্যতা থাকার দরুণ তাঁরা সুখেই আছে। সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক ভেদাভেদকে তাঁরা কখনওই মানেন না। সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে ফেলে রেখে 'মানুষের মতোন মানুষ হয়ে জীবনযাপন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। বাবু খানের মতে তাদের সম্প্রদায়ের ভালোবাসার এই মেলবন্ধন তাকে খুশি করে।

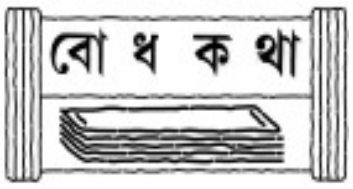

বোধ কথা

স্বচ্ছ জীবনের স্থৈর্য-ধৈর্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিব্রাজনে ছিলেন ভগবান তথাগত—বুদ্ধ দেব। সঙ্গে ছিলেন একনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ। হঠাৎ রাস্তায় যেতে যেতে ক্লান্ত ভগবান বুদ্ধের খুব তেষ্টা পেল। আনন্দ সামনের ঝর্ণা থেকে জল আনতে গেলেন। কিছুক্ষণ আগেই ওই ঝর্ণার উপর দিয়ে একটি গরুর গাড়ি পার হয়েছিল। ফলে জল ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য আনন্দ ওই জল না নিয়েই ফিরে এল। বুদ্ধ দেবকে বলল, ওখানের জল নোংরা হয়ে গেছে। পথে একটি নদী রয়েছে। তার জল নিয়ে আসছি। কিন্তু বুদ্ধ দেব বললেন, না, ঝর্ণার জলই নিয়ে এসো। আনন্দ আবারও ঝর্ণার ধারে গেল। দেখল জল তখনও অপরিস্কার। আবার ফিরে

গিয়ে একই কথা সে নিবেদন করল। এরকম ঘটনা তিনবার ঘটল। আনন্দ ভেবে পাচ্ছিল না গুরুদেবকে কি করে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ পানীয় জল দেবে? আবার গুরুদেবও ওই ঝর্ণার জলই পান করবেন বলে যেন জেদ ধরে বসে আছেন। বুদ্ধ দেবের আদেশে চতুর্থবার যাওয়ার পর দেখল, জল বেশ পরিষ্কার। ময়লা ধুলো-বালি সব নীচে বসে গিয়েছে। জল কাচের মতো পরিস্কার। এবার জল নিয়েই ফিরে এল। দেখে বুদ্ধ দেব বললেন, "আনন্দ, আমাদের জীবনরূপী জলকে কুবিচাররূপী গরুরগাড়ি রোজ রোজ অপরিস্কার ও ময়লা করে দেয়। তখন আমরা জীবন থেকে পালাবার পথ খুঁজি। কিন্তু সমস্যা থেকে সরে যাওয়া ঠিক নয়। মনরূপী ঝর্ণা স্থির হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এরজন্য ধৈর্য আবশ্যক। তখন দেখবে সব স্বচ্ছ। ঠিক ওই ঝর্ণার মতো।"

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ৬

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে মা শচীদেবীকে সন্ন্যাসী চৈতন্য প্রণাম করলেন। মায়ের কথামতো পুরীতে গেলেন।

পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তির সামনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথে কুষ্ঠরোগী বাসুদেবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে বাসুদেব সুস্থ হয়ে উঠল।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চারপুত্র রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ আশুতোষের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি শর্তসাপেক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। ইউরোপীয় সাহিত্য, শিক্ষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান— বিশ্বচিন্তার প্রায় নানা বিষয়ের বই এবং অসংখ্য দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে ৯৭,৫০০ পরিমাণ বই গ্রন্থাগারের ৪র্থ তলে ৮৮,০০০ বর্গফুট জুড়ে রাখা আছে। পরপর সাজিয়ে রাখলে বইসহ তাকগুলির দৈর্ঘ্য গড়াবে চার কিলোমিটারেরও বেশি।

*   *   *

চার্লস ডিকেন্স নাকি আমৃত্যু হাতির দাঁত ও সোনা দিয়ে মোড়া বস্তুটি ব্যবহার করেছিলেন। এতে তাঁর নামের আদ্যাক্ষরও খোদিত। সম্প্রতি নিউইয়র্কে নিলাম করা হলো এই প্রখ্যাত লেখকের ব্যবহৃত বস্তুটি। দাম উঠেছে ৯ হাজার পাউণ্ডেরও (৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) বেশি। জিনিসটি একটি টুথপিক। তখন তো আর 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'র চল ছিল না! ওই একটি যন্ত্রই তিনি ব্যবহার করতেন দাঁতের দেখভালের জন্য। দামটা কিন্তু সোনা বা হাতির দাঁতের দৌলতে নয়। গ্রেট এক্সপেক্টেশনস, অলিভার টুইস্ট-এর মতো উপন্যাস রচনা করতে করতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ডিকেন্স এটি ব্যবহার করতেন।

*   *   *

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অবিমৃশ্যকারিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও পরমকল্যাণবরেষু শব্দগুলির কথা মনে এলেই মনে পড়ে যায় সুকুমার রায়ের হ য ব র ল-র ন্যাড়ার কথা। ন্যাড়া তার গাড়ুর নাম রেখেছিল পরমকল্যাণবরেষু, ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জুতোর নাম অবিমৃশ্যকারিতা আর বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়, যা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ধসে পড়ে।

*   *   *

সমুদ্রের জলে নারকেলের মালা ডুবতে ডুবতে সেঁটে যায় জলের নীচে কাদামাটিতে। পড়েই থাকে, যদি না ওরা দেখতে পায়। যদি ওদের নজরে পড়ে তবে আর রক্ষে নেই! আট পায়ে খুরখুর করে এসে মালাটাকে টেনে তোলে, আট পা দিয়েই কাদা সাফাই করে। তারপর সেটাকে নিয়ে অন্যত্র সরে পড়ে এবং নারকেলের মালাটাকে উল্টে দিয়ে তার নীচে ঢুকে পড়ে। ব্যস, নিশ্চিন্তে ঘুমের দেশে চলে যায়। ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে গবেষকদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে অক্টোপাসদের এই আশ্চর্য বুদ্ধি। অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীরা 'টুল' (যন্ত্র) ব্যবহার করতে পারে, এই প্রথম জানা গেল।

র / ঙ্গ / কৌ / তু / ক

শিক্ষক ঃ তোকে যে বললাম লাইনের সবশেষে দাঁড়াতে!

ছাত্র ঃ গেছিলাম তো, কিন্তু সেখানে দেখলাম আগে থেকেই কেউ দাঁড়িয়ে আছে!

*   *   *

পাপু ঃ কী রে, কেমন পরীক্ষা দিলি?

দীপু ঃ আর বলিস কেন! কিচ্ছু পারিনি, তাই সাদা খাতা জমা দিয়েছি।

পাপু ঃ সে কীরে, আমিও তো ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা দিয়েছি। সার তো মনে করবেন আমি তোর খাতা দেখে নকল করেছি।

*   *   *

শিব ঃ বল্ ব্যাটা তুই কী বর চাস্।

ভক্ত ঃ আমাকে একটা সরোদ দাও বাবা।

শিব ঃ উঁহু, অন্য কিছু চা।

ভক্ত ঃ না বাবা, আমার সরোদই চাই।

শিব ঃ ইডিয়েট, সরোদ থাকলে আমি কি এই ডুগডুগি বাজাই?

*   *   *

রাজু ঃ মা, আজ লালু আসবে বলেছে। সব খেলনা লুকিয়ে ফেল।

মা ঃ কেন রে?

রাজু ঃ না হলে লালু ওর খেলনাগুলো চিনে ফেলবে যে!

*   *   *

নীতা ঃ সরকার বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে না কেন বল্তো?

গীতা ঃ কেন আবার, বিশুদ্ধ জলে ম্যালেরিয়া ডিম পাড়ে জানিস না?

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। কোন্ ভারতীয় ক্রিকেটার একবার অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হাইকমিশনার হন?

২। সবচেয়ে কম বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কে?

৩। কোন্ নবাব আখতারি পিয়া ছদ্মনামে গান লিখতেন?

৪। কোন্ বাঙালি মহিলা-অভিযাত্রী 'অ্যান্টার্কটিকা' বইটি লেখেন?

৫। কোন্ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। দলীপ সিংজী
২। রুডিয়ার্ড কিপলিং
৩। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ
৪। সুদীপ্তা সেনগুপ্ত
৫। লাভঁয়েশিয়ার

রাণাপ্রতাপের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয়তাবাদের সমৃদ্ধির অনুকূল হল তরুণ বিজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ একদিকে পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য নষ্ট করে অভ্যন্তরীণ শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষা, সম্প্রীতি-সৌহার্দ্র্য ইত্যাদি বুলি আউ'ড়ে সেই দোষ তথা দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আবার পাশাপাশি রাণাপ্রতাপের মতো বীরব্রতীদের স্মরণ মনন চিন্তনও চলছে। প্রশ্ন হলো, এভাবে চললে রাণাপ্রতাপের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হবে কি? প্রখ্যাত হিন্দি সাপ্তাহিক 'পাঞ্চ জন্য' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম মুখপাত্র তরুণ বিজয় গত ২৮ মার্চ কলকাতায় 'ওসয়াল' ভবনে 'রাজস্থান পরিষদ' (কলকাতা) আয়োজিত রাজস্থান দিবস সমারোহ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে এই প্রশ্ন তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ ব্যবহারজীবী তথা আয়কর উপদেষ্টা শ্রী সজ্জন তুলসীয়ান, স্থানীয় বিধায়ক দীনেশ বাজাজ, পরিষদের উপাধ্যক্ষ যুগোল কিশোর জৈথলিয়া প্রমুখ।

শ্রী জৈথলিয়া বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ত্রিশ ভাগ গরীবী রেখার নীচে, ত্রিশ ভাগ গরীব এবং ত্রিশ ভাগ জীবনযাত্রা নির্বাহে সক্ষম। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এইসব শ্রেণীর মানুষদের ভোটেই। অথচ জনপ্রতিনিধিরা বাস্তবিক অর্থে এদের জন্য কিছুই করেন না। শ্রী জৈথলিয়া দেশজুড়ে ইংরেজি ভাষার বাড়-বাড়ন্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অরুণপ্রকাশ মল্লাবত। (ছবি ঃ ১৬ পাতায়)

বিতর্ক অনাবশ্যক, অনিভপ্রেত ও অনুচিত

(১ পাতার পর)

করেছিলাম। যাতে তাঁর কথাগুলো অবিকৃত অবস্থায় স্বস্তিকা তার পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারে। আমরা ঠিক সেই কাজটিই করেছি। সুতরাং এই বিতর্ক পুরোপুরি অনাবশ্যক।

মহাশ্বেতাদেবী পরে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে তিনি আদৌ ১ মার্চের স্বস্তিকাটি পড়েননি। স্বস্তিকার কার্যালয় মারফত ডাকযোগে সেদিনের স্বস্তিকা মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হলেও হয়তো কোনও ডাক-গোলযোগের কারণে তা তাঁর হাতে পৌঁছোয়নি। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অতি সত্ত্বর তাঁর বাড়িতে ওই সাক্ষাৎকার নেওয়া স্বস্তিকার সংস্করণটি পৌঁছে দেওয়া হবে। সুতরাং অধীর আগ্রহে একটা অপেক্ষা থাকবেই— 'পরের মুখের ঝাল না খেয়ে' নিজের চোখে ১ মার্চের স্বস্তিকা দেখার পর তিনি কি মন্তব্য করেন, তা জানার।

কিন্তু একজন বিদগ্ধ লেখিকা ভালভাবে যাচাই না করে স্বস্তিকার মতো বাষট্টি বছর ধরে একটানা সুনামের সঙ্গে চলা একটা পত্রিকার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করলেন কেন? কথাপ্রসঙ্গে, সাক্ষাৎকারের সময় স্বস্তিকার 'শাসক-বিরোধী কণ্ঠস্বরে' খুশি হয়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সুযোগ হলে তাঁর 'নিয়মিত কলামে' স্বস্তিকা'র সম্পর্কে লিখবেন। সেই 'লেখা'টা যে এভাবে আসবে তা কল্পনাও করতে পারিনি সেদিন। যাই হোক, মহাশ্বেতা দেবী জানাচ্ছেন— একটি চিঠি তাঁকে বিচলিত করেছিল। যাতে কুৎসিতভাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে কুৎসা রটাচ্ছেন। মহাশ্বেতা দেবী ওই চিঠি প্রেরকের নামটা বলতে না পারলেও, সংশ্লিষ্ট প্রভাতী দৈনিকের সৌজন্যে নামটা আমাদের গোচরে এসেছে। সেটি হলো 'পিপলস ফোরাম ফর জাস্টিস'। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর জবাবী লেখায় পরিবার-পরিকল্পনা না থাকাটা যে মুসলমানদের পক্ষে যথেষ্ট সমস্যার তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে মৌলবাদী মুসলিমদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছেন। বাগনানের সাবিনার মধ্যেও হয়তো 'তসলিমা'র ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে (সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনওভাবেই নন) সেই সাক্ষাৎকারের সময় তিনি 'খড়্গহস্ত'ই ছিলেন। সেটাই তাঁর বাচনভঙ্গীতে ফুটে উঠেছিল;আর তা-ই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল ১ মার্চের স্বস্তিকায়। অনুপ্রবেশ সমস্যাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। শুধু 'অনুপ্রবেশকারী' আর 'উদ্বাস্তু'—এই দু'টো শব্দ-বন্ধনীকেই তিনি এক করে দেখেছিলেন। স্বস্তিকার পাতাতে তা-ও প্রস্ফুটিত। তাঁর মন্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে, এই অভিযোগ তাই ধোপে টেকে না। সুতরাং এই বিতর্ক অনভিপ্রেত।

২০ মার্চের সংবাদে প্রকাশ, মহাশ্বেতা দেবী এর মধ্যে 'সিপিএমের চক্রান্তে'র গন্ধ পেয়েছেন! তিনি ভুলেই গেছেন, 'কারা তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিল'! স্বাভাবিক, সাক্ষাৎকারের দিন সিপিএমের বিরুদ্ধে স্বস্তিকার 'লেখনী-যুদ্ধ' তাঁকে খুশি করেছিল। তিনি পরে এটা ভুলেছিলেন বলেই বোধহয় আমাদের কাগজে 'সিপিএমের চক্রান্তে'র গন্ধ পেয়েছিলেন! পরে তাঁর সাথে কথা বলে মনে হয়েছে, সিপিএমের এই চক্রান্তের গন্ধটা তাঁকে পাওয়ানো হয়েছে। তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে মৌলবাদীরা চটতে পারেন কারণ তাদের 'মৌরসীপাট্টা'য় এতে বেশ 'ঘা' লেগেছে। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই ওই সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। এঁদের লক্ষ্য অবশ্যই ২০১১। সেই কারণে ভিত্তিহীন অভিযোগ জানিয়ে ওই চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বলে অনুমান করা যেতেই পারে। মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ যে মুসলিম রমণীদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা একান্ত সাক্ষাৎকারে অস্বীকার করেননি মহাশ্বেতা দেবী। পাশাপাশি বলেছেন, হিন্দু সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবে তারা তাদের দোষত্রুটি সংশোধন করে নিতে পেরেছে, পক্ষান্তরে মুসলিমদের মধ্যে উদার মনের মানুষ খুব কমই আছে। তিনি যা বলেছেন, তাই ছেপেছি আমরা। ছাপার আগে একবারও ভাববার প্রয়োজন বোধ করিনি যে এতে কার স্বার্থে আঘাত লাগবে। কারণ স্বস্তিকা স্বামী বিবেকানন্দের আপ্তবাক্যটাকে স্মরণে রেখেছে—'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' সুতরাং এনিয়ে বিতর্ক একেবারেই অনুচিত।

রঙ্গম

রাজ্য অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘাটতি

বাংলা ছবির প্রদর্শনে প্রমোদ কর ছাড়

বিকাশ ভট্টাচার্য ।। বাংলা ছবির প্রযোজকরা বা হল মালিকরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রমোদ কর ছাড়ের আবেদন করেননি। বছর ৮/১০ আগে বাংলা ছবির যে দুরবস্থা ছিল এখন তাও নেই। বহু বড় বড় কর্পোরেট হাউস এখন বাংলা ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে আসছে। তবু একনাগাড়ে ২৪ বছর যিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরূপে কাজ করছেন সেই অসীম দাশগুপ্ত স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে এ রাজ্যে বাংলা, নেপালী ও সাঁওতালি ছবির প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রমোদকর এক লাফে ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করে দিয়েছেন। আর বিভিন্ন খাতে এই দাতব্য করতে গিয়ে মোট ৭৬ হাজার ৪৩২ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

বছর ২০ আগেও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে গিয়েছিলেন কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে। পরবর্তীকালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে সেই একই দাবী পেশ করা হয়। কি সেই দাবী? সরকারের হাতে এক অত্যাধুনিক স্টুডিও আছে - 'রূপকলা', সেটিকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার জন্য। শহরের মধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রূপকলাকেন্দ্র তৈরি হলেও এখনও ছবি-করিয়েদের এডিটিং মিক্সিং, ডাবিং ইত্যাদির জন্য ছুটে যেতে হয় সাউথ ইন্ডিয়ায়। সরকারের হাতে স্টুডিও আছে। যা স্যুটিং ইত্যাদির জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে মান্ধাতা আমলের সব যন্ত্রপাতি, অপরিচ্ছন্ন প্রায় ভেঙ্গে পড়া সেই স্টুডিওতে কাজ করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন ছিল আপনারা তো ছবি প্রদর্শনের জন্য প্রমোদ কর পান। তারই কিছু অংশ দিয়ে এইসব স্টুডিওর পরিকাঠামোর উন্নতি করলে বাংলা ছবির কিছুটা উন্নতি হয়। সরকার বছরের পর বছর ফাইলবন্দী সেইসব প্রস্তাবকে

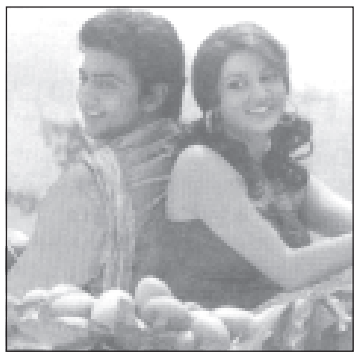

কাঁচকলা দেখিয়ে এখন প্রমোদ করই কমিয়ে দিলেন। ভোট বড়ো দায়। কিন্তু এতে লাভ হবে কার?

২০০৯ সালে কম-বেশি ৮০টি বাংলা ছবি হয়েছে। তারমধ্যে ৬৫টি ফ্লপ। অর্থাৎ লগ্নী করা অর্থ তুলতে পারেনি। অবশ্য প্রযোজকরা খাতায় কলমে এই হিসেব দিচ্ছেন। দুটি ছবি অর্থাৎ 'পরাণ যায় জুলিয়া রে' আর 'দুজনে' সুপার হিট। তবু এ বছর ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০টি ছবির টাইটেল রেজিষ্টার করা হয়েছে। এখন ডিজিটাল টেকনোলজির সাহায্যে প্রযোজকেরা একসঙ্গে একশখানা ছবির ক্যাসেট ছবির রিলিজের দিনই বাজারে ছাড়ছেন। মফস্বল শহরেও এখন ডিজিটাল ছবি দেখানোর টেকনোলজি এসে গেছে। বাংলা ছবির খরচ এখন তুলনামূলকভাবে টেকনিক্যাল কাজের ক্ষেত্রে কম। ফলে নতুন নতুন পরিচালক এগিয়ে আসছেন। পরীক্ষামূলক ছবি হচ্ছে। তবু এমন অনেক প্রযোজক আছেন কোটি টাকা খরচ করে ছবি করছেন। একটা ৫/৭ মিনিটের নাচের দৃশ্য তুলতে সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, হংকং বা মালয়েশিয়া যাচ্ছেন।

সুতরাং প্রমোদকর ছাড় দিয়ে এইসব ধনী প্রযোজক যারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভের গুড় নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরই পকেট ভর্তি করা হবে। বাংলা ছবির স্টুডিওগুলো, রূপকলা বা অন্য কলাকেন্দ্রগুলো বা এখনও টিমটিম করে চলা সিনেমা হলগুলোর কোনও উন্নতি হবে না। একথা একজন আনাড়িও বলতে পারেন!

শব্দরূপ - ৫৪৩

প্রতিমা মিত্র

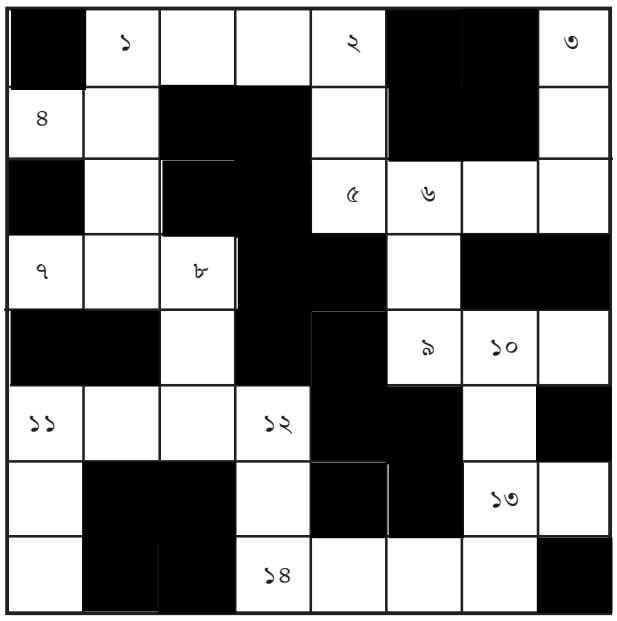

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. পৃথিবীর অধ্যক্ষ বা রক্ষক, ইন্দ্রাদি অষ্ট দিকপাল, দুয়ে-চারে যন্ত্র, তিনে ঠ্যাং, ৪. তৎসম লজ্জা, ৫. তৃণবিন্দু ও অপ্সরা অলম্বুষার কন্যা, যক্ষরাজ কুবেরের মাতা ও বিশ্রবা মুনির স্ত্রী, আগাগোড়া বুধের পত্নী, ৭. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যবিশেষ, প্রথম ঘরে জননী, ৯. নব জলধরের মতো কোমলতাও লাবণ্য যুক্ত, আগাগোড়া মানুষ, শেষ দুয়ে ধারণ করা পদবিবিশেষ, ১১. অন্য নামে সূর্য, শেষ দুয়ে খাজনা, ১৩. হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম, সৃষ্টিকর্তা, এঁর স্ত্রী সরস্বতী, বাহন হংস, ১৪. তৎসম শব্দে অগ্নি, বৈদিক ঋষিবিশেষ, দুয়ে-চারে শবদাহের চুল্লি, ইনি রাজা বাজশ্রবার পুত্র।

উপর-নীচ ঃ ১. অগস্ত্য মুনির স্ত্রী, দুয়ে ঠ্যাং, শেষ দুয়ে সিলমোহর, ২. মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসওদাগরের পুত্র, ৩. মিথিলার রাজা জনকের কনিষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মণের সাথে এঁর বিবাহ হয়, ৬. লগ্নর কথ্য রূপ, ৮. মিথিলার ধার্মিক রাজা, ১০. মহাতেজস্বী রাজা ধর্ম এর কন্যা ও ব্রহ্মার মানস পুত্র ঋষি মরীচি এর স্ত্রী, ১১. একই নামে ভগীরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ, ১২. রতনে——চেনে।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪১

সঠিক উত্তরদাতা

সুকান্ত আওন
বিষ্ণুবাটি, জামালপুর,
বর্ধমান-৭১৩৪০৪
ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া,
বেড়াবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া-৩
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

স্থ	ল	কু	মু	দ	■	■	ম
■	ব	■	■	শ	■	■	ন
■	কু	■	■	মী	মা	ং	সা
কে	শ	ব	■	■	রী	■	■
■	■	স	■	■	চ	র	কা
স	না	ত	ন	■	■	ক্ত	■
মী	■	■	সি	■	■	ফ	■
র	■	■	ব	রু	ণা	ল	য়

● ৫৪৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ এপ্রিল, ২০১০ সংখ্যায়

সি পি আই (এম) : চোরের বন্ধু, গেরস্তেরও বান্ধব

বিশাখা বিশ্বাস

ফুসফুসে ঘৃণার বাতাস। দাঁতে-জিভে নোনা রক্তের স্বাদ। কোথাও মানুষের শরীরে কাঁচা দগদগে ঘা-য়ে বসা মাছি, কোথাও পুঁজের গা ঘিনঘিনানি গন্ধ। না, এই রক্ত-ঘা-পুঁজ কেবল বিরোধীদেরই নয়, এ চেহারা তখন দলছুট সতীর্থ আপনদলের কর্মীগণেরও। সেটা প্রায় পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশ বছর আগেকার কাল।

সত্য-মিথ্যা বহু বিতর্কিত প্রচার-হুইসপারিং ক্যাম্পেন তখন এলোমেলো বাসন্তী-বাতাসের মতো দিশাশূন্য দিকভ্রান্ত করে দিচ্ছে বাহাত্তর থেকে সাতাত্তরের সিদ্ধার্থ জমানার সময়পর্ব-কে। নেহেরু ভালো কংগ্রেস খারাপ, লালবাহাদুর মহান কংগ্রেস পারনিশাস, ইন্দিরা গান্ধী মন্দ নন কংগ্রেসও ভালো নয় বলে চিরকাল চিরায়ত সময়ের জন্যে মানুষকে যারা ছলে-ছুতোয় মিছিলে-ময়দানে বিভ্রান্ত করে একদিকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাকে তুষ্ট করেছে, তোয়াজ করেছে এবং অন্যদিকে যুগপৎ মানুষকে কংগ্রেস বিদ্বেষে উত্তাল করে তুলেছে—ক্ষমতা দখলের পরই তারাই বিগত দিনের শাসকপার্টী এবং তার প্রশাসনিক 'পুলিশী বর্বরতার' বিরুদ্ধে বসালো কমিশনের পর কমিশন। যে গণশক্তি জরুরী অবস্থার মধ্যেই একদিন নামে-বেনামে চারের পৃষ্ঠায় ছেপেছিল "...ইট (গাছ লাগাও দেশ বাঁচাও নামক স্লোগানের সাথে বিশদফা কার্যসূচী) হ্যাজ ওপেন্ড আ নিউ চ্যাপ্টার ইন দ্য স্কাই অব ইন্ডিয়া" ইত্যাদি। একমাত্র জ্যোতির্ময় বসু-র ব্যক্তিগত কারণ ছাড়া যে সিপিআই(এম)-এর একটি মাত্র ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেনি জরুরী অবস্থার পুলিশ—সেই গণশক্তি পত্রিকাই ক্ষমতা দখলের পরেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আবার সেদিন লিখলো "...জনগণের শক্তি ওই স্বেচ্ছাচারী, ক্ষমতা প্রয়োগের ওই অত্যাচারী ঘাতকদের ঘাড় ধরে আনবেই...বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই (৫-৪-৭৭)।"

লিখেছি, হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনের কথা। কেবলমাত্র হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনেই একশ্রেণীর পুলিশ-অফিসারের ক্ষমতার অপব্যবহার, কংগ্রেস-এস-ইউ-সি এমনকি সিপিএম-এর 'আদর্শগত বেয়াড়া' কিছু কর্মীকে নির্যাতন এবং 'নারীঘাতী জঘন্য' অপরাধের জন্যে প্রায় সাড়ে ছয়শ' অভিযোগ দাখিল হয়েছিল, দলীয় ক্যাডারকুল তাদের সেই ঘোষিত এগারো শ'কর্মীর হত্যার বদলায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল—এক আশ্চর্য ঘটনা, সেই কমিশন তাদের শাস্তির বিধান দেওয়া সত্ত্বেও সেই সরকারই সেই সব ঘাতক-বাহিনীর (পুলিশ) বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করলো না! কেবল ব্যর্থ ব্যথায় পথে-প্রান্তরে সেদিন কেঁদে কেঁদে ফিরলো সেই শ্লোগান ঃ শহীদ তোমার রক্ত হবে নাকো
ব্যর্থ!... কিন্তু, ব্যর্থ হল গণশক্তি পত্রিকার সেই ৫ এপ্রিলের নিস্ফল হুহুংকার। নিস্ফল তাকে করলো ধুরন্ধর ঝানু সুচতুর কপটাচারী সেই ব্যারিস্টার যার কল্যাণী আশীর্বাদে সাড়ে সাতশ' টাকার এক শিক্ষাহীন দীক্ষাহীন কর্মচারী মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই হয়ে গেলেন এক বিশাল শিল্পপতি।

এরপর এলো মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধী পুলিশ অফিসারদের চিহ্নিত এবং সনাক্ত করার নির্দেশকে কার্যকরী করার নিমিত্ত শর্মা-সরকার তদন্ত কমিশন, যে কমিশন ১৯৭৯ সালের সম্ভবত শেষ লগ্নেই অন্তবর্তী প্রতিবেদনেই অপরাধী পুলিশ-অফিসারগণের দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তি সুপারিশ করে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজটা করবে কে—কেননা কমিশন কেবল সুপারিশই করতে পারে, সুপারিশ মানা-না-মানার অধিকার সংশ্লিষ্ট সরকারের। এগিয়ে আনা হলো তাই নবগঠিত বাম-সরকারের বিশ্বস্ত কংগ্রেস জমানার সেইসব ক্ষমতালোলুপ ক্রুরমনা শঠ এবং ধান্দাবাজ কতিপয় পুলিশ-অফিসারদের—কমিশনগুলির দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল। যে কৌশলে শালুকবনে ভালুক ঠাকুরের সাথে পরিচয় ঘটানো হয়েছিল গোপাল ঠাকুরের, সেই প্রক্রিয়াতেই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার এবং সিপিআই(এম)-এর উন্মুক্ত করা হলো অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন। তারপরই বাম সরকারের স্বার্থ আর পুলিশ-অফিসারদের লোভের মধ্যে ঘটলো কুশলী সমন্বয়, দেওয়া আর নেওয়ার চিরপরিচয়। অস্যার্থ ঃ মামলায় জিতলেন অফিসারেরা, তাদেরই প্রমোশন দিয়ে পছন্দসই পোস্টিং দিয়ে সরকার ঘোষণা করলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাইকোর্টের রায়ে ঘাতকবৃন্দের হাতেই তুলে দিতে হলো মানব ও মানবতাকে হত্যার পরোয়ানা, সিপি আই (এম)-এর দলীয় স্তরে ঘোষিত হলো 'আমরা প্রতিশোধে বিশ্বস্ত নই'।

কোন দানই ব্যর্থ হয় না, হলোও না। সিপিএম-এর খড়্গ হস্ত হতে রেহাই পেয়ে মামলার সেই ডিগ্রী হাতে নিয়ে সেইসব পুলিশ-অফিসারেরাও ঠিক করলেন 'আমাদের যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজিবে না'—বামসরকারের সাথে আমরা মিলিব, মেলাবো, কেউ বুঝিবে না। কেবল প্রতারিত মানুষ, দলীয় সাধারণ সমর্থক, সরলমতি কৃষক-শ্রমিক, বিশেষ ভাবে রাজ্য-কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে আত্মপ্রতারণার রোগী এই কলমচী পর্যন্ত সেদিন মাঠে-ময়দানে মিছিলে রাজপথে দিগ্বিদিক গরম-করা স্লোগানে ঘোষণা করলো, 'শহীদ, তোমার অমর মরণ কোরবো মোরা চিরবরণ—শহীদ, তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না।'...তা' আমরা 'শহীদ'-দের ভুললাম না, প্রমোশন তথা ভালো পোস্টিং প্রাপ্ত পুলিশ এবং পুলিশ-অফিসারেরাও বাম-সরকারের নিমক ভুললেন না, প্রতিটি অবাঞ্ছিত ঘটনার পর পরই বামফ্রন্ট সরকারের সরকারী দলীয় কার্যালয় থেকে বে-সরকারি নেতৃবৃন্দের ঘোষণা ও বিবৃতির ইঙ্গিতবাহী তাৎপর্য বুঝেই সেই সব পুলিশ ও তাদের অফিসারেরা তাদের প্রতিবেদন তৈরি করা শুরু করলেন এবং...এবং, সেই ট্র্যাডিশন আজো চলেছে।...

তাবৎ অপঘাত কর্মগুলিকে আইনী ন্যায্যতা দানের সিদ্ধেশ্বর সিপিআই(এম) এইভাবেই রাত্রির অন্ধকারে একদিকে স্বজনঘাতী শত্রুসংহারক হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে প্রচার-বিজ্ঞাপনের জৌলুসে সেই অপকর্মকে তারা প্রকাশ্যে ধিক্কার জানিয়েছে, একই নিঃশ্বাসে তারা দুধ ও তামাক একসাথে খেয়েছে—সিপিআই(এম)-র চর অনুচরেরাই সিদ্ধার্থ জমানার মানব হত্যাকারী নাট্যশিল্পীদের হাতকে একদিকে শক্ত করেছে, অন্যদিকে মিছিলে-মিটিংয়ে সেই জমানাকেই তারা ধিক্কারে-নিন্দায় উত্তাল হয়ে জনমনে বিরূপতর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি সেই জমানার প্রকৃত ঘাতক বাহিনীকেই তারা প্রমোশন দিয়ে নিজেদের মহৎ প্রমাণিত করেছে। তাই হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে তারা কোনও আপীল করে নাই, সুপ্রীম কোর্টে যায় নাই। ক্ষমতায়নের প্রথম শহীদ কিশোর নুরুল ইসলামের মা তাই আজও প্রতিকার চেয়ে দরজায় দরজায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছেন, শহীদ করিম হোসেনের সেই বিধবা জননীটি আজও পথে-প্রান্তরে চোখের জল মুছে
চলেছেন, কোচবিহারের সেই ধর্ষিতা সরকারী কর্মী শহীদ বর্ণালির প্রেতাত্মা সরকারী অফিসের অলিন্দে-অলিন্দে আন্দোলনকারীদের মুখে-বুকে থুথু ছেঁটায়—চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার...দিকে দিকে মানবশরীরে দগদগে ঘায়ে বসা মাছি...পুঁজের গলিত গা-ঘিনঘিনানি গন্ধ...পশ্চাতে কেবল জমাট বাঁধা বিস্মৃতি...মানুষ সব ভুলে চলেছে, ভুলে যাচ্ছে...হারিয়ে চলেছে সেই মরণজয়ী স্লোগান ঃ শহীদ তোমায় জানাই লাল, লাল, লাল
সেলাম!...

> “ তাবৎ অপঘাত কর্মগুলিকে আইনী ন্যায্যতা দানের সিদ্ধেশ্বর সিপিআই(এম) এইভাবেই রাত্রির অন্ধকারে একদিকে স্বজনঘাতী শত্রুসংহারক হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে প্রচার-বিজ্ঞাপনের জৌলুসে সেই অপকর্মকে তারা প্রকাশ্যে ধিক্কার জানিয়েছে, একই নিঃশ্বাসে তারা দুধ ও তামাক একসাথে খেয়েছে— ”

রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি প্রদান জে এস এম-এর

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ (জে এস এম)-এর পক্ষ থেকে গত ১৮ জানুয়ারি দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। ওই স্মারকলিপিতে সংশ্লিষ্ট বনবাসী নেতৃত্ব তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার এবং অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ করে জনজাতিদের ধর্মান্তরকরণের বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। জে এস এম-এর জাতীয় আহ্বায়ক হর্ষ চৌহান এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অবহেলায় বনবাসীদের 'নিরাপত্তা' বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এমনকী তাদের ন্যূনতম অধিকার সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রেও সরকার উদাসীন। আর এর ফলেই তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে চলছে ধর্মান্তরকরণ। এই সবক'টি বিষয়ই রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেছেন জে এস এম নেতৃত্ব।

ডঃ লোহিয়ার জন্মশতবার্ষিকী সভা

ভোলানাথ নন্দী ঃ মেদিনীপুর ॥ গত ৬ মার্চ, মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মন্মথনাথ দাসের সভাপতিত্বে বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া-র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অন্যতম বক্তা অধ্যাপক হৃষিকেশ পড়্যা বলেন যে দেশের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের উন্নতিকল্পে সমাজতন্ত্র প্রয়োজন বটে, তবে তা মার্ক্সবাদ বা মাওবাদ থেকে ধার করার প্রয়োজন নেই। স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী। নেতাজীও গণতন্ত্রের পথে সমাজবাদ চেয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এদেশের উপযোগী সমাজবাদী চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছেন। আজকের পাঠ্যসূচীতে স্বাধীনতার আন্দোলনে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়ার সমাজবাদী আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের উপর তারা জোর দেন। এছাড়াও বক্তা ছিলেন সমরজিৎ ব্যানার্জী, বিধায়ক রামপদ সামন্ত প্রমুখ।

মেদিনীপুর নাগরিক সমাজের সাধারণ সভা

সংবাদদাতা।। গত ৭ মার্চ মেদিনীপুরে স্থানীয় মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে মেদিনীপুর নাগরিক সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন ডঃ সুকুমার মাইতি। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে ডঃ সুরেশ দাস পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলের ব্যাপক খুন-রক্তপাতের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বে-আইনী অস্ত্র-উদ্ধার এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে যুদ্ধ কালীন ভিত্তিতে রূপায়ণ করে এলাকায় আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হয়। অরূপ দাশগুপ্ত, গৌরীশংকর সরকার, স্নেহাংশু লোধ, অনাথবন্ধু মণ্ডল প্রমুখ কেবল প্রতিবাদী কার্যক্রম না করে সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার কথাও বলেন।

Swastika
5 April - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

নৈতিকতায় আঘাত করতেই হিন্দুদের সংখ্যা কমিয়ে দেখাচ্ছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে এখন দুটি স্রোত বইছে। একটি প্রো-ইন্ডিয়ান, অপরটি প্রো-পাকিস্তানী। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য শেষোক্ত ধারাটি ভারতকে কিছুতেই ক্ষমা করতে চাইছে না। তারা ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। এই ধারাটির পেছনে চীনাপন্থী ও মৌলবাদীদের মদত রয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষমতায় যারাই আসুক না কেন, হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা আক্রান্ত হয়েছে। ইসলামিক র‍্যাডিক্যালইজম ভারতে রপ্তানী করা হয়েছে। ৫৭টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মাটিতে বসে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ মার্চ সকালে কলকাতায় মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক' নিয়ে এক আলোচনা সভায় সভাপতি হিসাবে একথা বলেন বাংলা দৈনিক স্টেটসম্যান-এর সম্পাদক মানস ঘোষ।

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন-এর আয়োজিত এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা অধ্যাপক অসীম কুমার মিত্র, হিন্দী সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'-এর প্রাক্তন সম্পাদক তথা বিজেপির মুখপাত্র তরুণ বিজয়, অধ্যাপক মোহিত রায় ও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত ভাষণে ডাঃ সুজিত ধরের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের উল্লেখ করে শ্রী মিত্র বলেন, ডাঃ ধর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক তথা একনিষ্ঠ কার্যকর্তা ছিলেন। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকে প্রসারিত করার জন্য তিনি 'যোগক্ষেম' নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট মহলে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হোত।

ভাষণরত মানস ঘোষ। তাঁর ডানদিকে তরুণ বিজয়, বাঁদিকে মোহিত রায় ও অরিন্দম মুখার্জী।

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টিকে মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আলোচ্য বিষয় হিসাবে পৌঁছে দেওয়া দরকার বলে তরুণ বিজয় মনে করেন।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করে মানসবাবু বলেন, হাসিনা সরকার পাকিস্তান-পন্থীদের মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে জঙ্গি- ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মেঘালয়ে বি এস এফ জওয়ানদের নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তিনি বারে বারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে চীন থেকে অস্ত্র আমদানি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পাঁচটি তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি হয়েছে। রেল, সড়ক ও জলপথে দু'দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হবে। এইসব উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনা টার্গেট হয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকেও শ্রীঘোষ স্বাগত জানান।

অধ্যাপক মোহিত রায় বলেন, এদেশে ভারত-বাংলাদেশ নিয়ে চর্চার অভাব রয়েছে। এজন্য অবশ্য আমরা নিজেরাই দায়ী। চর্চার জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য চাই এবং এজন্য একটি গবেষণা কেন্দ্র দরকার। ইজারায়েলে যেমন হলোকাস্ট মিউজিয়াম রয়েছে, তেমনি ভারতেও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন প্রদর্শনের জন্য মিউজিয়াম প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

রাণাপ্রতাপের স্মরণিকা হাতে (বাঁদিক থেকে) রুগলাল সুরানা, অরুণ প্রকাশ মল্লাবত,নন্দলাল শা, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ডঃ দেব কোঠারী, সজ্জন কুমার তুলসীয়ান, দীনেশ বাজাজ (বিধায়ক), এস এস জৈন, পরশুরাম মুন্দ্রা, মহাবীর বাজাজ।

হিন্দুদের নৈতিকতাকে আঘাত করার (মরাল ডাউন) জন্যই বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে বলে সভার অন্যতম বক্তা অরিন্দম মুখার্জী অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় পৌনে দু'কোটি। প্রায় ১৪ শতাংশ। ভারতের হিন্দু সমাজের মতো দোষত্রুটি বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান। বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতের নৈতিক সাহায্য চায়। হিন্দুরা নির্যাতিত হলে ভারত সরকার প্রতিবাদ করবে—এটা তাদের প্রত্যাশা। বাংলাদেশের ইতিবাচক সংবাদ প্রচার হওয়া দরকার। আশার কথা বাংলাদেশের হিন্দুরা ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে, যদিও হিন্দু নির্যাতন ঘটছে।

এদিনের সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষ পর্বে সকলকে ধন্যবাদ জানান ট্রাস্টী অরুণ ভট্টাচার্য।

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান
১১ই এপ্রিল, ২০১০, রবিবার সন্ধ্যা ৬টা
স্থান ঃ– কেশব ভবন, ৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬
– ঃ প্রধান বক্তা ঃ–
মাননীয় মধুভাই কুলকর্ণী,
সদস্য, কার্যকারিণী মণ্ডল, আর এস এস

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০
নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৭
মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় হিন্দুত্ব মানে জীবনধারা। ভারতীয় পরম্পরার প্রবাহিত এই ধারা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে আবদ্ধ। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুমেলার গৌরবগাথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বোধিত করলেও আজকের সংবাদ মাধ্যমগুলি হিন্দুবিদ্বেষে সিদ্ধহস্ত। দেশভাগ, অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ ও সন্ত্রাসী আক্রমণে হিন্দুরা আজ আতঙ্কিত। সীমান্তের পাড়ায় পাড়ায় হিন্দু নিগ্রহ আজ নিত্যদিনের ঘটনা। কেমন রয়েছে পদ্মাপারের হিন্দুরা, প্রবাসে হিন্দুত্ব কিভাবে টিকিয়ে রেখেছে তার অস্তিত্ব। হিন্দুর বিপদ আজ কোথা থেকে—এসব নিয়ে স্বস্তিকার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা।
– লিখেছেন –
মোহনরাও ভাগবত, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, তথাগত রায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ গুহ, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, গূঢ়পুরুষ, শ্যামলেশ দাস, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল প্রামাণিক, সত্যনারায়ণ মজুমদার, অরিন্দম মুখার্জী, প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী, নৃপেন আচার্য প্রমুখ।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
২৭ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com